

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী

(তৃতীয় ভাগ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত



৪৩৩-৩

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

রাজ-সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, "বঙ্গমতী-বৈদ্যাতিক-রোটারী-মেশিনে"

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

মূল্য ২১ দুই টাকা

৮১০
২৭

Mout

- | | |
|----|------------------------|
| ১। | কুশলাকান্ত |
| ২। | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা |
| ৩। | গুপ্তের কবিতা |
| ৪। | বঙ্গদর্শনের বিদায় |
| ৫। | বঙ্গদর্শনের পুনরুত্থান |
| ৬। | পূর্ব-সংস্করণে যুগলিনী |
| ৭। | মানস (কবিতা) |
| ৮। | ললিতা (ঐ) |
| ৯। | সাম্য |

কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



Motil

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমন নহে। কিছু ইংরেজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব-স্ববোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্থ কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক-মূলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান, যাহারা কেবল কতকগুলি বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মত গণ্ডমূর্থ।

কমলাকান্তের এক বার চাকরী হইয়াছিল। এক জন সাহেব তাহার ইংরেজী কথা শুনিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরানীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরী রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া আপিসের কাজ করিত না। সরকারী বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠি-পত্রের উপরে সেক্সপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত, বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাসকাবারে পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিল-বহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। সাহেব নতুনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরী সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ

ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়ি থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমি তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না; সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলে তাহাতে মাথামুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত, শুনিলে আমার আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিহ্নিত, পুরা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল, বলিয়া গেল, “তোমাকে ইহা বখশিশ করিলাম।”

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই, পুণ্য লোকহিতৈষিতা আমার চিন্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথা জন্ম। এই দপ্তরটিতে স্নিগ্ধার অত্যাশ্রুত ওষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। বাহারা অনিদ্রা রোগে पीড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থ আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

কমলাকান্তের দপ্তর

প্রথম সংখ্যা

একা

“কে গায় ওই?”

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ছায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরঞ্জে, প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে; পার্থক্য পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের সন্দেহ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ ধীর; মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাংসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাজের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ছায় ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন?

কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কোমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃত সুন্দরীর নীল-বস্ত্রের ছায় শীর্ণ-শরীরী নীলসলিলা তরঙ্গিনী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রোচা, বুদ্ধা বিয়ল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনা-কীর্ণ নগরীমধ্যে ঐ অনন্দময় অনন্ত জনশ্রোতোমধ্যে আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনশ্রোতোমধ্যে মিশিয়া এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবদ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে আর একটি বদ্বন্দ্ব না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্রে, আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

সত্যি জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অথ কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম খা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি ভ্রাণগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্ত ফুটে না। পরের জন্ত তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্তুত করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোন্মিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যোবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমন্ডরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্যচারিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায় যে স্নেহে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্ত আবার যোবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে সমবেত বন্ধুগণলীনে বসিলাম, আবার সেই অকারণসজ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিশ্চয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিশ্চয়োজনেও চিন্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম, আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিন্তের যে প্রফুল্লতার জন্ত ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যোবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিস্মৃচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে ক্ষুধি কমে কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছকল্লোলিনী-শীতকরসিক্ত, বসন্তপবন-বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি

বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রত্নিন কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রত্নিন কাচ। যৌবনে অর্জিত স্নেহ অল্প, কিন্তু স্নেহের আশা অপরিমিত। এখন অর্জিত স্নেহ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার, আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আনাকে গ্রহণ করিয়া আবার আনাকে কুলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমের কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিব আছে, উদ্ভানে সর্প আছে, মনুষ্যদ্বয়ে কেবল আত্মার আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কাচও হীরকের হ্রাস উজ্জ্বল, পিতলও স্রবণের হ্রাস ভাস্কর, পদ্মও চন্দনের হ্রাস স্নিগ্ধ, কাংশুও রজতের হ্রাস মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকর্তৃত্বাত সঙ্গীত, তেমনই সংসারে এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিলেই জন্ম আমার চিত্ত আবুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিল না? শুনিল, কিন্তু নানাবাচ্যধ্বনি-সংমিলিত, বহুধর্ম-প্রসূত সেই পূর্বপ্রসূত সংসারগীত আর শুনিল না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতোঁছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্তসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যবদন্তপ্রীতি বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অল্প স্নেহ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য-ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল-বিশেষ—মায়ারূপে সংসারবৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে; পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে চোকরায়, কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ব হইয়া আহরিত হইলে গদাগলে দৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ব হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শূণ্যে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়;—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকালজাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর। কখন কখন বিমাইতে বিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক পৃথক সমুদায়ের মনুষ্য পৃথকজাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়ামনুষ্যবাদীগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভূতুড়িসার গোরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দালনা রাখিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শূণ্যের দৌরাণ্ড। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই; যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই, নইলে শূণ্যলোকাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শূণ্যলোকাঁটাল কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছাবেব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছির তনু ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছির কাঁটাল চাহ না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিরি কল্যাণভরগ্রস্ত, উহাকে এক কোঁটা রস দাও—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের ক্ষয়ে একখানি সংবাদপত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও। এ মাছিরি কাঁটালের পিসীর ভাস্করপুত্রের খাল্যুর আলীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও;—সে মাছিরি টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এ দিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল নয়—পাচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল

ভাদ্রিয়া, উত্তম নির্জল দুধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ছায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিবল সার্কিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্য-জাতিমধ্যে আত্মফল মনে করি। এ দেশে আত্ম ছিল না, সাগর-পার হইতে কোন মহাদ্বা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আত্ম দেখিতে রাদা! রাদা, রাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলি আম এমন কদর্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাদা রাদা হয়, বিক্রোতা ফাঁকি দিয়া পুঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি কাঁচা-মিটে আছে—পাকিলে পান্শে। কতকগুলি জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া ছুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আত্ম খাইতে জানেন না। সুস্থ গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পর ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কল্যাণাচ্ছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা, কদলীকলের সঙ্গে তুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাদি কাদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলক, কমলকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই বুঝাইবার অল্পরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্গুণ—আমি ইহাদিগের ভূতাস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারে নারিকেল। নারিকেলও কাদি কাদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখনও কাদি কাদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারগার অমুরোধে অথবা বৈশাখমাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্ত একটি আখটি পাড়ে। কাদি কাদি পুড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ছায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকাচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়,—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণশূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়।

কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়। নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জল ছায়া,—কেমন জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে,—যেন সে নবীন ছায়া-শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাদি কাদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাদি কাদি বুঝী, আমার চক্ষু একই দেখায়,—উভয়েই চতুর্দিক আলো করিয়া থাকে, কিন্তু দেখ,—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না, বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না,—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আত্মের ছায় ডাবকেও বরফজলে রাখিয়া শীতল করিও, বরফ না জোটে, পুরুরের পাকে পুত্ৰিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও,—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্ত, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর। যক্ষ্মা তুমি সংসারের রোদ্রে দগ্ধ হইয়া ইপাইতে ইপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিরোগ-বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সম্ভাপে আর কি সুখ আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে বুঝো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা বুঝো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্ত নারিকেলের মধ্যে ডাবের আদর।

নারিকেলের শস্ত, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকাচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় কঠিন, দস্তফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে! গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বাঁসা আছে, মায়ের অলঙ্কারের বাস হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু বুঝো শস্ত এমন কঠিন যে, মায়ের দাঁত বাঁসল না—বুঝো দয়া করিয়া একটি মা'কড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—বুঝো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—বুঝো পুঁজির উপর

দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দস্ত ফুটাইয়া দিলেন—
বুড়া বয়েসে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল,
নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা
ফিরাইয়া দেন, তত দিন—অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা
হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিজ্ঞা—কখন
আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের
মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিজ্ঞাও বড় নয়।
মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন বা জর্জ
এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মনদ হয় নাই, কিন্তু দুই
মালার মাপে।

ছোবড়া—স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া নারিকেলের
বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড়
অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায়
একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জ প্রস্তুত হয়, তাহাতে
জাহাজ বাঁধা যায়, স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক
জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের
কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে
কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ টানা
শরণের আইন হইবে, তখন তাতে এ রথ টানা নিবেদের
জন্ত যেন একটা ধারা থাকে, তাহা হইলে অনেক
নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের
রজ্জ গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে কি
না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জ গলায় বাঁধিয়া কত লোক
প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বুকের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে
আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগ্য, দুয়ের এককেও
আহরণ করিতে পারিলাম না। অচ্ছ ফল আকর্ষী দিয়া
পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায়
না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি
বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে
হইবে। *

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু
আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল জোটে না।
আমি যেমনি মানুষ, তেমনি গাছে, তেমনি রূপগুণের
আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু
ভয়, পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্রামী,
বানী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে
করিয়া সংসারবাত্মা নির্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ।
অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিতাবে নারিকেল
ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিবেন। তিনি একে আশানবাসী,
তাহাতে আবার বিবপান করিয়াছেন—ছাই ডাব—
নারিকেল তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে একজাতি লোক সংপ্রতি দেখা দিয়াছেন,
তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি
শিমূলফল ভাবি। যখন ফল ফটে, তখন দেখিতে
বড় শোভা—বড় বড় রান্ধা রান্ধা, গাছ আলো করিয়া
থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে তত রান্ধা ভাল
দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল
দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রান্ধা দেখা
যায়, সেই সুন্দর; ফলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতামাত্র
পাই, কিন্তু তব ফল বড় বড়, রান্ধা রান্ধা। যদি ফল
ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু
লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে
চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর ঘু ফল ফট
করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা
বাহির হইয়া বদদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মগণ সংসারের ধূতুরাফল। বড় বড়
লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি
সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কষ্টকর
ধূতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে,
কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব। কিন্তু
অধম ধূতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের
মধ্যে এই যে, এই ধূতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি
করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার
গাঁজার সঙ্গে দুটো ধূতুরার বাঁচি সাজিয়া দাও—
যে সিদ্ধি খোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির
সঙ্গে দুটা বাঁচি দাও; নেশা জমিয়া উঠিবে। বোধ
হয়, এই হিসাবেই বন্ধীর লেখকেরা আপন আপন
প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া
গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধূতুরার
বাঁচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায়
বদদেশ আজিকালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল
বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর গিটে, কিন্তু
হৃৎকোণে স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে। গুণের
মধ্যে কেবল অল্পগুণ—তাও নিষ্ঠুর, তবে এক গুণ
মানি, ইহার সাফা কাষ্ঠাবতার। তেঁতুলকাঠ নীরস
বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়ান ভাল; সত্য
কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম
বলিতেছে। কেন না, পুরোহিতই বিবাহ দেয়। উঃ!
কি প্রাণ্ড!

দেখিতে পাই না। যে কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অন্ন উদগার করে। যে অধিক পরিমাণে খায়, সেই অন্নপিত্তরোগে চিররুগ্ন। বাহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া গ্যাসের আলোতে বা আগাগোড়া জ্বলিয়া ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাটা-চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু বাহাদিগকে চাল-বরে বসিয়া মুদ্রে পাথর কোলে করিয়া পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, ঠাঁহাদিগের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ো দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলায়ের দাল আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অল্প ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহার পৃথিবীর কুম্ভাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহার উচুতে ফলিলেন, নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড়-বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপে কুম্ভাণ্ড, গুণেও কুম্ভাণ্ড। তবে কুম্ভাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুম্ভাণ্ড ও বিলাতী কুম্ভাণ্ড। বিলাতী কুম্ভাণ্ড বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুম্ভাণ্ডগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারী জুতাকে ইংরেজী জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুম্ভাণ্ডার যে গৌরব অধিক, ইঁহা বলা বাহুল্য। সংসারোত্তানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য কদম্ব টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি * বা উদরদর্শন

বেহাম্ হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই হিতবাদ-মতে অমত করি না, বরং

* “ইউটিলিটি” শব্দের অর্থ কি? ইঁহার কি বাদলা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই; অতএব অগত্যা আমার পুঙ্খকে

আমি ইঁহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি এক জন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ-দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু গড়িয়া একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহা বাদ্দালায় প্রচলিত হিতবাদ-দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা-মাত্র! তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথা অনুসারে দর্শনটি স্ত্রত্রাকারে লিখিত হইয়াছে এবং আমি স্বয়ংই স্ত্রত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাদ্দালাতেই স্ত্রত্রগুলি লিখিত হইয়াছে, আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ, মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃত স্ত্রত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে? অতএব সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাদ্দালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়াছি। সেই স্ত্রত্রগ্রন্থের সারাংশ এই :—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য

“বৃহৎ”—অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যুভায় আছে।

“জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর”—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পৃষ্ঠের প্রত্যাশা করিতে পারেন।

“গহ্বর”—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঙ্গগুলি প্রভৃতিও উদরमध्ये গণ্য। কোন স্থানে উদর পূরাইতে হয়, কোন স্থানে অঙ্গগুলি পূরাইতে হও।

২। উদরের ত্রিবিধ পৃষ্ঠিই পরমপুঙ্খবার্থ।

ভাষ্য

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদরপৃষ্ঠি।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—“ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা, “টিল” শব্দে চাষ করা, “ইট” শব্দে খাওয়া, “ই” অর্থে কি, তাহা বলিতে পারিল না। কিন্তু বোধ করি, কমলাকান্ত “ইউ টিল ইট ই” পদে ইঁহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও।” কি পাষাণ! সকলকেই চাষা বলিল। ঈদৃশ দুর্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজী লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এইরূপ দুর্ব্বল শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দস্ত ফুটাইয়া দিলেন—
বুড়া ব্যসে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল,
নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না ঢাকা
ফিরাইয়া দেন, তত দিন—অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা
হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিত্তা—কখন
আখ্যান বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের
মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিত্তাও বড় নয়।
মেরি সময়বিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন বা জর্জ
এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন হয় নাই, কিন্তু দুই
মালার মাপে।

ছোবড়া—স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া নারিকেলের
বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড়
অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায়
একটি কাজ হয়—উত্তন রজ্জ প্রস্তুত হয়, তাহাতে
জাহাজ বাঁধা যায়, স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক
জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের
কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে
কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ টানা
শরণের আইন হইবে, তখন তাতে এ রথ টানা নিষেধের
জ্ঞাথেন একটা ধারা থাকে, তাহা হইলে অনেক
নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের
রজ্জ গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে কি
না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জ গলায় বাঁধিয়া কত লোক
প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বুকের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে
আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগ্য, দুয়ের এককেও
আহরণ করিতে পারিলাম না। অচ্ছ ফল আকর্ষী দিয়া
পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায়
না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি
বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে
হইবে। *

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু
আমার ভাগ্যদোরে কপালে নারিকেল জোটে না।
আমি যেমনি মানুষ, তেমনি গাছে, তেমনি রূপগুণের
আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু
ভয়, পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক স্থানী,
বানী, রানী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে
করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ।
অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিভাবে নারিকেল
ফলটি বিশ্বেরকে দিবেন। তিনি একে আশানবাসী,
তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব—
নারিকেল তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে একজাতি লোক সংপ্রতি দেখা দিয়াছেন,
তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি
শিমুলফুল ভাবি। যখন ফুল ফটে, তখন দেখিতে
বড় শোভা—বড় বড় রান্দা রান্দা, গাছ আলো করিয়া
থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে তত রান্দা ভাল
দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল
দেখাইতে; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রান্দা দেখা
যায়, সেই সুন্দর; ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতামাত্র
পাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রান্দা রান্দা। যদি ফুল
ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু
লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে
চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লব্ধ ফল ফট
করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা
বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধূতুরাকল। বড় বড়
লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের আঁঠি
সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কষ্টকর
ধূতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে
কুকুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব। কিন্তু
অধম ধূতুরাগুলার কাঁটার জালায় পারিলাম না। গুণের
মধ্যে এই যে, এই ধূতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি
করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার
গাঁজার সঙ্গে দুটো ধূতুরার বাঁচি সাজিয়া দাও—
যে সিদ্ধি খোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির
সঙ্গে দুটা বাঁচি বাটিয়া দাও; নেশা জমিয়া উঠিবে। বোধ
হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপন আপন
প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া
গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধূতুরার
বাঁচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায়
বঙ্গদেশ আজিকালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল
বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু
হৃৎকোপে স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে। গুণের
মধ্যে কেবল অল্পগুণ—তাঁও নিরুপদ্রব, তবে এক গুণ
মানি, ইহার সাফা কাঠাবতার। তেঁতুলকাঠ নীরস
বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়ান ভাল; সত্য
কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম
বলিতেছে। কেন না, পুরোহিতই বিবাহ দেয়। উঃ!
কি পাবও!—

দেখিতে পাই না। যে কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অন্ন উদগার করে। যে অধিক পরিমাণে খায়, সেই অন্নপিত্তরোগে চিররুগ্ন। ষাংহারা গাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া গ্যাসের আলোতে বা আগাগোড়া জ্বলিয়া ফুজু খানসামার হাতের পাক, কাটা-চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু ষাংহাদিগকে চাল-বরে বসিয়া মুদ্রে পাথর কোলে করিয়া পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, ষ্ট্রাহদিগের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায় দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলায়ের দাল আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফুজু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি নমুস্যফলের কথা বলা হইলেই অল্প ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহার পৃথিবীর কুম্ভাও। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহার উচুতে ফলিলেন, নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুলিয়া দাও, একটু বাড়-বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপে কুম্ভাও, গুণেও কুম্ভাও। তবে কুম্ভাও এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুম্ভাও ও বিলাতী কুম্ভাও। বিলাতী কুম্ভাও বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুম্ভাওগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারী জুতাকে ইংরেজী জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুম্ভাওর যে গৌরব অধিক, ইঁহা বলা বাহুল্য। সংসারোচ্চানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য কদম্ব টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি * বা উদরদর্শন

বেহাম্ হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই হিতবাদ-মতে অমত করি না, বরং

* “ইউটিলিটি” শব্দের অর্থ কি? ইঁহার কি বাদলা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই; অতএব অগত্যা আমার পুঙ্খ

আমি ইঁহার অল্পমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি এক জন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ-দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু গড়িয়া একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহা বাদ্দালায় প্রচলিত হিতবাদ-দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা-মাত্র! তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথাশাস্ত্রের দর্শনটি স্বত্রাকারে লিখিত হইয়াছে এবং আমি স্বয়ংই স্বত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাদ্দালাতেই স্বত্রগুলি লিখিত হইয়াছে, আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ, মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে স্বত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে? অতএব সাধারণ পাঠকের প্রতি অল্পকূল হইয়া বাদ্দালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সেই স্বত্রগ্রন্থের সারাংশ এই :—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য

“বৃহৎ”—অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যুভায় আছে।

“জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর”—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পুষ্টির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

“গহ্বর”—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঙ্গগুলি প্রভৃতিও উদরमध्ये গণ্য। কোন স্থানে উদর পূরাইতে হয়, কোন স্থানে অঙ্গগুলি পূরাইতে হও।

২। উদরের ত্রিবিধ পুষ্টিই পরমপুঙ্খবার্থ।

ভাষ্য

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদরপুষ্টি।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—“ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা, “টিল” শব্দে চাষ করা, “ইট” শব্দে খাওয়া, “ই” অর্থে কি, তাহা বলিতে পারিল না। কিন্তু বোধ করি, কমলাকান্ত “ইউ টিল ইট ই” পদে ইঁহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও।” কি পাষও! সকলকেই চাষা বলিল। ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজী লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এইরূপ দুর্ব্বাহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

“আধিভৌতিক”—অন্নব্যঞ্জন, সন্দেশ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্তি।

“আধ্যাত্মিক”—বাহারা বড়লোকের বাক্যে লুঙ্ক হইয়া কান্যাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি হয়।

“আধিদৈবিক”—দৈবানুকম্পায় প্রীতি, যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা বাহাদের উদর পূরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত।

ভাষ্য

“বিহিত”—বিহিত শব্দের দ্বারা অত্যাশ্রয় পূর্তির প্রতিবেদন হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদর নামক মহাগহবরে লুচি-সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান হইতে পারে, তাহা নির্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিত্তা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল এবং প্রতারণা, এই ষড়বিধ পুরুষার্থের উপায় পূর্ব-পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য

(১) “বিত্তা”—বিত্তা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুস্তুরশাবক ডিম ভেদ করিবাগাত্র জলে গিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিত্তা বান্ধলার স্বভঃসিদ্ধ, তজ্জন্তু লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

(২) “বুদ্ধি”—যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লোহ, লোহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। রূপণের সহিত ধনরাশির ত্রায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা গোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য, কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্পপরিমাণে পাইয়াছি।

(৩) “পরিশ্রম”—উপর্যুক্ত সময়ে দৈবত্ব অন্ন-ব্যঞ্জন-ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ুসেবন, তামাকুর

ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য-সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

(৪) “উপাসনা”—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষ কীর্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হইলেন, তবে তাঁহার দোষ কীর্তন করাকে নিন্দা বলে। আর যদি তিনি দোষযুক্ত না হইলেন, তবে তাঁহার দোষকীর্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণপক্ষে তিনি যদি গুণহীন হইলেন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে ত্রায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হইলেন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে উপাসনা বলে।

(৫) “বল”—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ-চক্ষুর আরক্ত-ভাব—ঘোরতর ডাক-হাঁক—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরেজী এবং নিষ্ঠাবনের বৃষ্টি—দূর হইতে ভদ্রী দ্বারা কিল, চড়, ঘুবা এবং লাথি-প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিপায় প্রকার অত্যাশ্রয় অদ্ভুতদ্বী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উত্তম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়বিধ, যথা—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল, চড়-প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুস—রোদনাদি। যথা চাণক্যপণ্ডিত—

“বালানাং রোদনং বলং” ইত্যাদি।

স্রোচ—প্রহার-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দেব, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

(৬) প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্ডজীবী। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা-মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে, পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি, এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্মোপদেষ্টা এবং ধার্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক। ইহাদের নাম “ভণ্ডা” ইহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূতি বা পুরুবার্থ অসাধ্য।

চতুর্থ সংখ্যা।

ভাষ্য

এই স্বত্রের দ্বারা পূর্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা হইতেছে। বিজ্ঞাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যেখানে উদরপূতি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

“বিজ্ঞা”—বিজ্ঞাতে যদি উদরপূতি হইত, তবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অনাভাব কেন?

“বুদ্ধি”—বুদ্ধিতে যদি উদরপূতি হইত, তবে গদ্যভ্যাস মোট বহিবে কেন?

“পরিশ্রম”—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালী বাবুরা কেরানী কেন?

“উপাসনা”—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অল্পগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই!

“বল”—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

“প্রতারণা”—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান সময় সময় ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূতি বা পুরুবার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য

উদাহরণ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা লোকের কানে মজ্জা দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বস্ত্রজাতির হিতসাধন করিয়াছেন এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-এসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে স্ববিক্রয় এবং অবিক্রয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূতি অর্থাৎ পুরুবার্থ লাভ হইয়াছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য

এই শেষ স্বত্রের দ্বারা হিতবাদ-দর্শন এবং উদরদর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের স্বত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জলিতেছে—পাশে আমি মোসাম্বিক-ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন—আমি আফিম চড়াইয়াছি। বিমাইতেছি। দলাদলিতে চাটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিখিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া-পরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প রাত্রে নগীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অল্পথা করি।

বিমাইতে-বিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফাল্গুনের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। “টো-ও-ও-ও” “বো-ও-ও” করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের কোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি ব্রিটিশে পারি না? কিছুক্ষণ কষ্টে পাতিয়া শুনিলাম, কিছু ব্রিটিশে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, “তুমি কি ও টো বো করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু ব্রিটিশে পারিতেছি না।” তখন হঠাৎ আফিম-প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম। শুনিলাম পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।” আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

“দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে,—পিতলের পিলস্‌জের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই, প্রবেশ করিবার পথ পাই না। পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে, আমাদের চিরকালের হক। আমরা পতঙ্গজাতি পূর্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন প্রভু? আমরা গরীব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাইব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না, আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময় আশা-বিসর্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ছায় স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক, আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ, আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জলন্ত রূপে শরীর না ঢালিতাম, তবে এ শরীর কেন? অথ জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না কেন এ শরীর?—জহিয়া কি করিব? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুষন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না? তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ পোড়াইতে জন্মিয়াছ; আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক—আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বব্ধংস্কম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গাঁতের কারণ—কারণ ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমার দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না, আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু, আমার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না, জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ শেষ হবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙিতে পারিব না? ভাল, থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি। “বো—ও—ও—”

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, “কমলাকান্ত,” আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় চুলিয়া পড়িয়া-

ছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, বোধ হইতে লাগিল, যেন সে চোঁ বো বলিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্যমাত্রই পতঙ্গ, সকলের এক একটি বহি আছে; সকলেই সেই বহিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে, সেই বহিতে মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহি, ধনবহি, মানবহি, রূপবহি, ধর্মবহি, ইন্দ্রিয়বহি—সংসার বহিম্বর। আবার সংসার কাচময়; যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিচ্ছে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বো করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ছায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচত? অনেকে জ্ঞানবহির আবরণকাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রোতস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। অনেকে রূপবহি, ধর্মবহি, মানবহিতে পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাতারতকার মানবহি সৃজন করিয়া হৃষ্যোদন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন, জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহিজাত দাহের গীত “Paradise Lost”; ধর্মবহির অদ্বিতীয় কাব্য শেষ্ঠ পল। ভোগবহির পতঙ্গ “আটনি, ক্লিপেত্রা।” রূপবহির “রোমিও ও জুলিয়েত,” ঈশবহির “ওথেলো,” গীতগোবিন্দ ও বিভাষ্মনরে ইন্দ্রিয়বহি জলিতেছে। স্নেহবহিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্ত রামায়ণের সৃষ্টি। বহি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে, ধর্ম-পুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ তাই পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আশুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, বো করিয়া চলিয়া যাই।

তীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার “মনচোর” কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

এক জন বন্ধু বলিলেন, “দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে।” মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও-কাবাব-কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্টি-সমারুতা অন্নপূর্ণার যুহ যুহ ফুট-ফুট, বট-বট, টকবকোন্ধনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মংস্ত সতৈল অভিষেকের পর বোলগদ্যায় স্নান করিয়া মুমায়, কাংস্তময়, কাচময়, রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন দ্বিতীয় দধীচির ত্রায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসমুজ্জ্বল সেই অস্থিতে কোবুরাক্রম বজ্র নির্মিত হইয়া ক্রুরাক্রম বুত্রাসুরবধের জন্ত প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই ইন্দ্রদ্রোণের জন্ত বসিয়া থাকে। যেখানে পাচকরূপী বিষ্ণুকর্কট লুচিরূপ সূদর্শনচক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মনরাহ গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অথবা যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড-মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক, হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা এবং তাহার বয়ঃক্রম বাট বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্ত বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গন্ধলাভ হাওয়ায় এটি ঘটে পাই।

সুহৃদের প্রবর্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না, পলায়কোফতা প্রভৃতি অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন,—তাহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, “একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান।” প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল

বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটা-মোটা, গোল-গোল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিশি, হাসিভরা মুখ, কপালে একটি ছোট উল্কি টিপের মত দেখাইতে; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে বাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্ত লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারী বামনের জ্বালায় গাছে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিম্নকূলের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না, নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্ত আমি যত দুঃখিত হই না হই, প্রসন্নের জন্ত আমি একটু দুঃখিত, কেন না, প্রসন্ন সত্যী সাধবী পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এ জন্ত সৎ বা সত্যী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্ত সাধবী এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এ জন্ত ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ তাহার গওদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নিৰ্জল এবং দামে সস্তা। দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে এক দিন আমাকে কহিয়াছিল, “দাদাঠাকুর, দপ্তরে ও কিসের কাগজ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘শুনব?’ সে বলিল, ‘শুনব।’ আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত শুনে কোন্ লিপি-ব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের শুণের কথা আর অধিক কি বলিব, সে আমার অনুরোধে আকিম ধরিয়াছিল।

এই সকল শুনে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত; ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানালার নীচে নয়, তাহার গোয়াল-ঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মদলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর-সর-নবনীতের আকর, দ্বিতীয় তাহার দানবত্রী। গন্ধা বিষ্ণুপদ হইতে জমাগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাহাকে আনিয়াছেন; মদলা আমার বিষ্ণুপদ, প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকে সমান

ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই উভয়েই সুন্দরী, উভয়েই স্থলাদী, লাবণ্যময়ী এবং ঘটৌরী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হান্তরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজিকালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গন্যকতলে অথবা তাহার গোয়ালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাদিতে কাদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোহুল্যমান কুঙ্কিতালকরাজি গভীর-কৃষ্ণ ক্র-মুগল এবং গভীর চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলো ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। গমনে যেরূপ অঙ্গ ছলিতেছিল, বোধ হইল যেন, লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল যেন, পূজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। শ্বেফিরিয়া দেখিয়া দ্বৈব রূপতাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি ও? সঙ্গে নিয়েছ কেন?”

আমি বলিলাম, “তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ?” যুবতী কটুভক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, “চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী স্ত্রীসম্মুখে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর করিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।”

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার মন নাই। শারীরিক সুখসচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্তালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্তালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি হেঁজু পুঁথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথায় গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদগের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতেই মন বাধি নাই, এজ্ঞা কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনাদের রাইলান—পরের হইলাম না, এই জ্ঞতই পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী

হইয়া স্ত্রী-পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজ্ঞা তাহারা সুখী; নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জ্ঞাত আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশ, ইন্দ্রিয়াদিলক্ষ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথমবারে যেরূপ সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয়বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হইতে, অর্থাৎ গুরুতর অসুখ হয় এবং অপরিতোষাণী আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্ত বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা; ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ; ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; মন পত্নীজারেও ভোগ করে; মান-সম্মান মেঘমালায় তার শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তি-দায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়। এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যা কখনও অক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছি, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই, কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমন কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্যকরিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, এমন অকাটা প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেরই তাহার জ্ঞাত প্রাণপাত করে। এ কেবল সুশিক্ষার গুণ। মাতৃসুহৃৎস্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্বসারবত্তার বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদান পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গুরু, ভৃত্য, প্রাতিবেশী, শত্রু, মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ! হা যশ! হা মান! হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটবার আগেই সেই পক্ষে গুরুতর করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে—যত বিদ্যানু, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আশ্বালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্জন ভিন্ন মনুষ্যের সুখের মূল আছে কিনা? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্যন্ত নুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,

এক দিন মল্লযাত্রাে আমার এই কথা বুঝবে যে, মল্লযাত্রার স্থায়ী স্মৃতির অল্প মূল নাই। এই যেমন লোকে উদ্ভব হইয়া ধনমান-ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মল্লযাত্রাতি সেইরূপ উদ্ভব হইয়া পরের স্মৃতির প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা এক দিন ফলিবে, কিন্তু কত দিনে? হায়, কে বলিবে কত দিনে?

কথাটি প্রাচীন। সার্ব-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শতসহস্র শিক্ষক শতসহস্রবার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মনুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গওগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মেট্রিকুলেশন প্রস্পেকটিভ” * উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসর্গ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজগণিত বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদসাধনেই নিবৃত্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিশ্বত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অত্যাচার দেবমূর্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে। সিন্দু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্ত! দেখিতেছ, কিন্তু, কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আশুনি নিবাহিতে পারিবে? ঐ যে রূপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃণ-নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান দূরহইতে পারিবে? রূপোন্নতির ক্রোড়ে রূপসাকে মিলিয়া বসাইতে পারিবে? না পার, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাদ্দাল, যে সংবাদপত্র, সাময়িক-পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেকচার যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর

টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা মতি, টাকা গতি। টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ। ওপথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে; ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়িও, টাকা বাড়িও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রযুক্তি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ি, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার বানবানিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক। মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাসে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ! হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। এ পূজায় তাম্রাশ্রমধারী ইংরেজ নামে ধাবিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতত্ত্ব হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সংবাদপত্র সকল ঢাক ঢোল, বাদ্দাল সংবাদপত্র কাঁসীদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে আইস, যশোগদ্যার জলে মৌত করিয়া বঞ্চনা-বিল-দলে, মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল—ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়। বাজা ভাই কাঁসীদার ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিতমহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন স্মৃতিটুকু লইয়া স্বাহা স্বাহা বলিয়া আঙুনে ঢালুন। কোথা ভাই হিউটলিটেরিয়ের কামার! পাটা হাড়িকাঠে ফেলিয়াছি; একবার বাঁবা পঞ্চানন্দের * নাম করিয়া এক কোপে পাচাড় কর। হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়ইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর।

পূজা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটা কত কথা বরাইয়া দাও। তোমার বাহ্যসম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাই না—আমি হকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মন্ত্র, মাংস, গাড়ী-বুড়ী, পোষাক এবং বেশা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সেই মন্দের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই! গর্ত বজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত বজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত বজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই, পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন মাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধনে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শাস্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

-এক্ষণে কমলাকান্ত বৃত্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

এই তৃণ-শল্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে এই ফুটচন্দ্রালোকে আজি দণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবরবৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না টেলস শর্মা টয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রীসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ খাস ত্যাগ করিতেন? এইরূপ চন্দ্রালোকেই না খিসবী স্মন্দরী এইরূপ মুহু শিশিরপাতসিক্ত শল্প মুহূপদে দলিত করিয়া পিরমেদ্রের সঙ্কেতস্থানভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে 'অভি' একটি উপসর্গ আছে, স্ব 'একটি ধাতু' আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গড়িল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না; কমলাকান্ত-উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না, কমলাভিসারিণী এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি-দুগ্ধ বিক্রমার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমন্তাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না। তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে—ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছে? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-বল-কিরণ-রাশি স্তব্ধাংশে! আর আর সকল তোমার থাক, তুমি অন্ততঃ অশ্রুবা-ন্যাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ও দুটুকু বড় ভালবাসি। আমার মত নিরক্ষর লোক উহার কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসস্থ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া সুখে কাল কটন করিব। উহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে। লোকে 'মিছে অক্ষমতা নিবন্ধন কোন কর্ম করিতে না পারিয়া', উহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লইতে পারে। আমিও নদীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্মিণীর স্নেহে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দানোলিত বক্ষোবসন করম্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে বালক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মুগি-মুক্তা-মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি, তুমি ছড়াইয়া থাক; আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বনাল সেনের প্র-পর-অপ পৌত্রেরা এবং তাঁহার নিরু-দুর-বি-অধি দৌহিত্রেরা অগ্নিকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বৃক্ষের উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিবে হয় না। এইবার সংসার ডুবিবে। উচ্চশিক্ষার ফল কি? ছাপরখাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পটুবসনাবৃত্তা একটি বংশখণ্ডিকা। হরি হরি বল ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বি, এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী-বস্ত্র-বংশ-খট্টাসমেত সজ্ঞানে গদালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন! তাঁহার উচ্চ শিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক-পরিমিত রক্তপাত্র, শত তোলকপরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটারের একমাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাস্তিত হেমকূট-পর্যটনকটস্থ কিষ্কিন্দ্যাপুরীর সরকারী ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষাভ্যর্থ বহু যত্নে কামস্কটকা দেশের নদী সকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়া ছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্ত তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্তমনে সাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্তই মালিমানের উর্দ্ধে বায়ান পুরুষ, নিয়ে সাড়ে তিপান পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষাবলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউন হলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম-পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল; এবং বংশদণ্ডিকার স্থাপন করিয়া, উদ্যোদর-গোষ্ঠীর বৃদ্ধি

করিয়া দেশ জয়লময় করিতে পারিলেই কলির জীব-ধর্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশদণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয়, তাও কর্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা-আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্তাদি বিবাহ করিব; যদি টাকার জন্ত বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—যোমটাটানা চাঁদবন্দনাদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথ! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূজটীর জটাকলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া মন্তো অবতরণ করিয়া, সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমল করিয়াছিলে বলিয়াই সগরবংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঙ্গনার অঞ্চল লইয়া চিরকীড়াসক্ত থাকিতে অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দনশাখা নমিত করিয়া বা এলা-লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে “স্বমেব জগজ্জীবনং পালনং” বলিয়া আর তোমার স্তব-স্তুতি করিত? এই বালবসন্তবিহারী বিহঙ্গকুলের কাকলী যদি কেবল নন্দনকাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মণীলেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদসাগরতলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবালপালঙ্কে, মৌক্তিকশয্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখমণ্ডলেক তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমায় ভর্তৃকা লইয়া খলু সার স্বপ্নরমন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমলশর্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশান-নিকট বটতলার তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশি—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম। শশি! তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরিরূপে অনিমেঘনয়নে বসিয়া থাক; আবৃত্তি শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর; বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া,

* বোধ হয়, এই রাত্রি হইতে কমলাকান্তের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবাস।

একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শনলাভার্থ ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার দ্বিধা দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকাচুরী খেলিতে থাক; নববধু যখন মন্দ-বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া ক্রমে তাহাকে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গহৃদয়ে ধীরপ্রবাহে মন্দ-গতিতে সিদ্ধ অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণভূষণে ভূষিত করিয়া, আশীর্বাদ করিয়া পথপ্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাব যখন বসন্তরাগে এক বৃন্তে চারি দিক দেখিয়া হেলিতে-দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতীলতাকে চুষন করিতে কানে কানে পরামর্শ দাও। আবার সেই তুমিই, অসদতিসন্ধিস্থ নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমন ভ্রুকটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না। তুমিই নরহত্যা-কারীর তরবারফলকে বিদ্রাঘ চমকাইয়া দাও, তাহার পাপ শোণিতবিন্দুতে চোঁষটি রোরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দাও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ-স্বর্ণহালী; তরুণের আশাপ্রদীপ; যুবকযুবতীর যামিনীষাপনের প্রধান সম্ভোগপদার্থ এবং স্ববিব্রের স্মৃতিদর্পণ। তুমি অনাথার গ্রহরী; স্থির দীপধারা; তুমি পথিকের পথপ্রদর্শক; গৃহীর নৈশ-সুখ্য; তুমি পাণীর পাপের সাক্ষী; পৃথ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জল মণি; জগতের শোভা; আর এই ঋশীনবহারী ত্রীকমলাকান্তের একমাত্র সখল। তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ, রসে রস, বিরসে বিব। তুমি কমলাকান্তের সহধামিণী। শশি—আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি বল ভাই।

বম্ তোমানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদিগের আধ্যাত্মে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি, * ইংরেজি মতে চন্দ্র শী, এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

* হি, শী, কাহাকে বলে? শুনিয়াছি—দুইটি ইংরেজি সর্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ। শ্রীভানুদেব।

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে গুজরাতিদালি শাহ লক্ষ্মী নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস, হংসী, কপোত, কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাব সহিত বারিহুদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়মুগুণী পিঞ্জরহ বলবলিকে সম্মত পলায় প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশবাংসল্যে ঐহিক সুখসম্পত্তি বিসর্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা তিস্তার শ্রেয়ো-বোধে, নেপালের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না! তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান ওলিয়াস দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব-প্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব? আর যে বেডফোর্ড—তাঁহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্ত সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব? না, যুদ্ধ-কৌশল বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলিয়ান, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক-ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্বস্বস্বী স্থির করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডির নিকট কর যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে নাদম ফ্রোভিলড দেবো স্বীয় প্রতাপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব? রোমক পণ্ডনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্রিপেট্টা একপ তিনজন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্তন হইতেছিল, যখন কীর্তন-গায়িকা বলিল—“সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিত?” এবং বদ নব্য-সম্প্রদায়েরা বজ্র-সুন্দর্য চিত্র-পুত্তলিকার গ্রায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যলী যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোনগুলি হি, কোনগুলি বা শী, তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্তনকারিণী হি এবং তাহার জড়বৎ শ্রেতৃবর্গই শী, বাস্তবিক বদীর যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী। এবং সর্বত্র বিকল্পে ইট হন। তাহার নিত্য বিধিও আছে। যথা ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী এবং বিষয়কর্মে ইট।

তাহারা বক্তৃতার সময় হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট। ফলে ইট যাছা হউক, হি-শীর বিষয়ে আমার আপনাআপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুর্ঘ্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিক্রপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসঙ্গ স্বচ্ছন্দে পূর্বদ্বন্দ্ববৃত্ত তাহার মন্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুর্ঘ্যের বক্ষঃকবাটের বলপরিষ্কারকরণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসঙ্গ সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নদীবার কি না এক দিন বলিয়াছিলেন যে,—“চক্রবর্তী, বিমূর্তে বিমূর্তে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি”—সেই ভয়ে আফিমের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জ্ঞানই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ-বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কি শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী। কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের তালবাসা জন্মিয়াছে; এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত এক জন কমলাকান্ত চক্রবর্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকস্মাদিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোনারচাঁদ শনাক্তে স্পর্শ করিতে স্পন্দিত করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা মাতৃসেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নসেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বাক্ষণীসেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধমতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া কঙ্কিমতে সংহারমুক্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাস্ত্র মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়, তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরসালমের প্রথম গোরাদের উপদেশমত তজন-শালা করিতে হয়, মেজো গোরাদ নবদীপবাসীর মত হরিসংকীর্ণন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গোরাদের মত সংস্কৃত-শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

স্বতরাং শশি, পূর্ণশশি, আমি তোমাকে ইংরেজি মতে শী স্থির করিয়া, খোসবাহালে, সুস্থশরীরে, খোস ভবিষ্যতে ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরমস্বখে অত্মের বিনা সন্নিবিষ্টে তোমাকে ভোগদখল করিতে থাকিব। ইহাতে যদি তুমি কিংবা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া পা টিপিয়া, চলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা कहিলে কি হইবে? আর অমন করে মুচকে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তরতর করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোটসিপ সমাপ্ত:—

এক্ষণে গান্ধার্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুগি বরমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্তা হৈল কন্য বরকর্তা বর।

নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥

একবার হরি বল তাই! হরি হরি বোল!

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না—কমল ফুল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র যান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্বে—

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,

কিন্তু

কমল-হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি।

বর বড় না ক'নে বড়? এই দেখ বর বড়—

চন্দ্রে সবে বোল কলা হাস বুদ্ধি তায়,

চক্রবর্তী পরিপূর্ণ, এক কাঁদি কলায়।

সেই কলা কত লুপ্ত কত বর্তমান,

কমলের বাগানে সব বর্তমান।

দেখ শশি! এখন নিঃস্নান হইল। তোমাকে

গোটা কতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গাম্ভীর্য হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না! যখন পুঙ্খশোকাভূরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া, তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে?

তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘাস্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসার-জালা-জালে লোকে দম্ব হইয়া, তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসার-দম্ব, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য তীব্র বিষক্ষেপরূপ হইবে।
 ✕ বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। সে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া, আত্ম-বিসর্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া পরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময়-অসময় নাই, ঘটন-বিঘটন নাই, সুখ-দুঃখ নাই। তুমি সর্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজ কথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থিমজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কমল-কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অতঃপর আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অতঃপর হইতে মাস গণনা করিয়া প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গন্ধাতীরে শম্পবাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণমাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না, পঞ্জিকাভাগের সহিত দিনক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ এক দিন রাহ তোমাকে পশ্চিমধ্যে হঠাৎ মগীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নববধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে, ধর্মযাজকতার তাণ হয়। ✕ স্মরণে অলমতিবিস্তরণে।

এখন একবার,

কমল-শশীর বাসর-ঘরে,

ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।

এখন শশি, একবার এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অঙ্গরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উন্টাইয়া পড় দেখি। একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, রক্ত-পথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহার ষোমন পরম্পর সংগ্রাম করিতে

আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার ঐশ্বর্য সঞ্চালনে-শ্রান্তিবোধ করিয়া মুক্তা-বিনিমিত স্বদেশ-বিন্দু-সিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগন-গবাক্ষে স্থির-দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু-সেবন কর দেখি। একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোর-চক্রে অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তিসাধন কর দেখি! একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশি, তুমি ক্ষীরোদসাগরজা, ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন দোষে দোষী বলিতে পারি না—এখন একবার স্ত্রীপুরুষ-ভেদে জটিলত-জালচ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসঙ্গের নাম করিয়া-ছিলাম বলিয়া, এত অভিমান আজকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনি, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অত্যাধি Lunatic * নাম ধরিলাম। জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাশাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাহারা বলিল, তোমাকে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ? তবে এই সংসার-গরলখণ্ডন, এই গিরিতরুশিরসিমগুন, এই করলেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি ঐ অনন্ত নীল বৃন্দাবনের মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া একবার রাই মানিনী হইয়া বসো! আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে † ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই। আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্রফলক। আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শতসহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কস্তা, পুরোহিত, ষটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নবপল্লবিকা শাখা-স্বন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া না পাগল।

† আমি জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর পায়ে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সে দুঃস্বপ্ন জন্ম।

শ্রীভীষ্মদেব।

করপত্র-সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমখী স্বচ্ছ সরসীদর্পণে আপনার মুখ বন্ধিম-গ্রীবায নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থল-কমলে গুল-কমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নিরীক্ষণী রামধনু ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোক-নুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনু স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্তশয্যায় স্বর্ণাদি মণিভূষায় ষোড়শরে ভূষিত হইয়া উত্তরদক্ষিণ শয়নে নিদ্রা পাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কানে বুঝকা দোলাইয়া, শ্রাম চিকুর-রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌরকিরণে ঈশত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বুঝকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না, যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো ছুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন; যখন নদীবাবুর তালুকের নিজের বনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার স্বাভাতি পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, হাট লাগিয়া যায়—কত কবিতা, শ্লোক, গীত,

হেটো ইংরেজী, বেটো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া-ইংরেজীতে নদীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলিসঙ্কুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাসে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নদীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার গারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নদীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এ জন্ম আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এ জন্ম আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এ জন্ম আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এ জন্ম আসিতে পারিলেন না। আগল কথা সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে; বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উঃ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উঃ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরাম-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু,” তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু—উঃ।” যখন পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দেম, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, “কু—উঃ,” কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশ্রুত, পরাম-প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া উপর্যুপরি বিহ্বল পুষ্পস্তবক লইয়া ছলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখন ডাকিয়া বলিও, “কু—উঃ।” যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এক কালে ফুটিয়া, আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, “কু—উঃ।” যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘন-বিহ্বল মধুর-শ্রামল স্নিগ্ধোজ্জল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণ-ঘোবনা সুন্দরীর লাভণ্যের ত্রায় হাসিয়া হাসিয়া,

ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া ছলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে, তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুসুম হইতে ডাকিও, এ “কু—উঃ!” যখন দেখিবে, শুভ্রমুখী শুভ্রশরীরী সুন্দরী নবমালিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রার্থকের হাস দেখিয়া ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—সুরে সুরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাঞ্জি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—“আদরেতে আঙুসারি”—কণ্ঠভরা গুন্ গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন হে কালামুখ! আবার “কু—উঃ” বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িমশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহস্থপুস্পরূপিণী কন্তাগণে সেই লতার দোলানি, সেই গন্ধরাজের প্রফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর ঐ পঞ্চম স্বরে গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা, এ “কু—উঃ!” ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চমস্বর। নহিলে তোমার ও কু—উঃ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্ট্রেল প্রভৃতির ছায়—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে তত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাড়িচাটা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে যিনি বাজে নভেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পালিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে কোকিল, তুমি প্রকৃতির পালিয়ামেন্টে দাড়াইয়া নক্ষত্রায়, নীলচক্রাতপ মণ্ডিত, গিরিনদী-নগরকুঞ্জাদি বেষ্ট্রে সুসজ্জিত, এ মহাসভাগৃহে তোমার এ মধুর পঞ্চমস্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হেষ্টিংস পর্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। “কু—উঃ!” ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতার কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্বীজাতি বধনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুকড়ো বাবাজি “কু কু কু কু” বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে

আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চোঁহিলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে। বেপরদা বা কড়িমধ্যনের কাজ নয়। সার জেমস্ মাকিন্টশ তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফিরি* কড়িমধ্যম শিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর যেকলে রেকটরিকের† পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ স্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বুদ্ধি পিতামাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্ত বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট—তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—স্বরের পঞ্চম, আর আলতা-পরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে সুর পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট, ছোট পায়ের পঞ্চম পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন স্বর পঞ্চম, কোন স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিগিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর, বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—বৈবত, গান্ধার, নিসাদ, পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোরাজ, তানপুরা, দাড়ী-দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত স্বর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন শুনিয়া মদলা গাইয়ের সন্তঃপ্রসূত বৎসের ধনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নিরঞ্জল দুগ্ধের অনুরাগে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝি হয় না। আমি গায়কের নিকট ক্লতজ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মদলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখে দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে, আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াই—আমিও এই সংসার-কাননে,—গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দম্পর লিখিয়া বেড়াই—আয় তাই,

* দর্শন।

† অলঙ্কার।

তোতে আনাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই,— আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা ঐ আঁকিমের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে করে ডাকিস? আমিই বা করে? বন্দে দেখি পাখি, কাকে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বলিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত, সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌছিতে, আমারও ডাক পৌছিতে। যদি সূর্য-শব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌছিতে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে তুই জনে পঞ্চমস্বরে ডাকি।

তবে কুহুরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বন্দে দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমাত্যবী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাশ্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে উড়িয়া, কখন কি “কুহু” বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক দেখি রে!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

অষ্টম সংখ্যা

শ্রীলোকের রূপ

নিজের ক অনেক ভাঙ্গিনী রূপের গোরবে পা নাটাতে দেন
রীজাতি ভাবেন, যে দিক দিয়া অন্ধ দৌলাইয়া চলিয়া
পাণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়।

নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন,
তাঁহাদের রূপের বাড়ি যে দিকে বয়, সে দিকে
সকলের বৈষ্যচালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্মকোটা ভাঙিয়া
পড়ে; যখন পুরুষের মুন-চড়া তাঁহাদের রূপের
বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম জাহাজ, ধর্ম্ম-
পান্সী, বুদ্ধির ভিত্তি সব ভাসিয়া যায়। কেবল
গৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলের এইরূপ প্রতীতি
নাহে; পুরুষেরাও যখন মোহিনীশক্তির বশীভূত হইয়া
তাঁহাদিগের রূপের মাহুনা বর্ণনারস্ত করেন, তখন যে
তাঁহারাও কি বলেন, তাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।
তখন গগনের জ্যোতিষ, পৃথিবীর পর্বত, পশু-পক্ষী,
কীট-পতঙ্গ, লতা-গুচ্ছাদি সকলকেই লইয়া উপমার
জন্ত টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই
অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের
সহিত তুলনা করিয়া, তাঁহারা পূর্ণশরীকে নিমন্ত্রণ
করিয়া, আবার মসীবে ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান।
গরীব চাঁদ আপনার কলঙ্ক আপনি বকে করিয়া
রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে।
সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উবার
সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে
সূর্য্যদেব পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর
আশ্রের হান্তরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-কমলে
সৌর-রশ্মির লাস্ত বা বিকসিত কুম্ভে কৌমুদীর
নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সে
অবধি কমল-কুম্ভে কীট-পতঙ্গের অধিকার।
কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা
নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন;
বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অল্পশীলন তাগ
করিয়া তাঁহারা স্বর্ণকারের বিছায় মন দিবেন।
রত্নীর্ণ শরীর-সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাভণ্যলীলা
বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ
মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্র বা নিয়ত কম্পিত
শিঙুহিল্লোলে চঞ্জিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন
উঠে না। এই জগুই বা রাত্রে নিদ্রা যান এবং
নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন।
আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন
সরোবরের মলয়-মারুতে দৌল্যমান নীলোৎপল
দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল
লাগে না।

এই নারীমুগ্ধির স্তাবককুলের উপমাভূষণভঙ্গির
কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের
কল্পনা-প্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খগন, চকোর,
কখন মৎস্য, যথা সফরী, কখন উদ্ভিদ, যথা পদ্ম,

পলাশ, ইন্দীবর, কখনও জড়পদার্থ, যথা আকাশের
তারা। এই চন্দ্র কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও
তাঁহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর এবং
ক্ষুদ্র কমল-কোরক একেরই উপমাশ্রুত, কিন্তু
ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িয়, কদম্ব, করিকুন্ত
এই বিবম উপমাশ্রুতলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর
ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ
হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈবম্য থাকাই স্বাভাবিক
উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণীকুল-
চরণবিশ্রাসের অনুকারী। আবার যে-সে-হাতীর
গমনের সহিত এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য
নির্দেশ করা বিধেয় নহে। যে হাতী হাতীর রাজা,
সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি
তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর
যাইতে পারে, অর্থাৎ কোন পশু তত পারে না।
যাহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই
গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন?
যে দিকে রেইলওয়ে হয় নাই, সে দিকে
বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে
কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত
ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর
শ্রায় সুন্দর বস্ত্র আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক,
কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাব
প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুম-
মালিকার শ্রায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে
কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি
কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম, বর্ষার উজ্জ্বল-
সলিলা চিররদ্বীপী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর
পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে
ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি
মানময়ী-মানবীমণ্ডলের কুহকজাল ছিন্ন করিয়া বাহির
হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে
রাখব বোয়াল পড়িলে যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন
করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র
মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে
জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন

করিয়াছি, দুরন্ত গোর একবার দড়ি ছিঁড়িতে
পারিলে যেমন উদ্ধ্বাসে পলায়ন করে, আমি
তেমনি দোড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই
আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ আফিম দেবী!
তোমার কোঁটা অক্ষয় হউক! তুমি বৎসর বৎসর
সোনার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা থাইতে
যাও; জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা
সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক! তোমার
নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলা-
কান্তকে পায়ের রাখিও। আমি তোমার রূপায়
সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই
চারিট কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক
পুরুষও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি
নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া
গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে,
ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্মিকসমাজ, বিদ্বান-সমাজ
শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর
মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল।
ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্মিক-সমাজ, বিদ্বান-সমাজ
আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না;
গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্যবিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য
স্বীকার করেন। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা
স্বীকার পাইয়াও, রূপের টাকা স্ত্রীলোকের মস্তকে
দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা
স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিরুপ। হে মানময়ী
মোহিনীগণ! কুটিলকটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া
আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না, কালসপ-
বিনিদিত বেণী দ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না,
জ-বন্ধুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে
বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা
করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-
ফাদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া,
তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্-
ছার! তোমাদের নখের নোলক খসিয়া পড়িলে
মাছুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের
একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে
লাগে, তবে তাহার হাড়পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে।
অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে :

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের
তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিশ্রাস হইতে
পারে—যথা নখর-নিকর-হিমকর-করশিত-কোকিল-
কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা—

শ্রীভীষ্মদেব।

* কোপনিকস P D

প্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময় সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উত্তত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্ত দেবতার প্রকৃত মূর্তি পরিত্যাগপূর্বক বিকৃত প্রতীমূর্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দস্তুর প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণ লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চকুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্টপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপে যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্ত লালায়িত হয় না। যে বস্তুতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব-মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক-জগন্নাথকে দোলায়। যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাইকানরূপ নানা ফলফুল পশু-পক্ষিবিশিষ্ট বাগানের ঘোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে স্নাতনরফাঁসির দড়ী টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্ত্রীপাত্রী বান্ধুরদিগের ভীতিবিধান করে। যে অলঙ্কার বিনা আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সম্ভব থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়; অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য-বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বুকের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কটের যেমন সুন্দর তাত্রচূড়া ও পক্ষসকল আছে, কুক্কটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুন্দর। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল “বিদ্যাসুন্দর”-কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদ্ভিত হইয়াছিল? এই জন্তই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে?

সৌন্দর্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু রূপাঙ্ক ভাগিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। বুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পয়তাল্লিশে পুরুষের যে স্ত্রী থাকে, বিশ-পঁচিশের উর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর তায়। ইন্দ্রধনুর তায় মুহূর্তের জন্ত না হউক, অত্যল্পকালে জন্ত সন্দেহ নাই। যাহারা রূপভোগে উন্মাদ আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি,—আমার জীবনে যোর দুঃখ এই যে, অমব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যরূপ বুড়ী চালের তাত, প্রণয়কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য যায়? শেষে বেশ-ভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদা-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্যগর্ভিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্ত কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের তায়

পলাশ, ইন্দীবর, কখনও জড়পদার্থ, যথা আকাশের
তারা। এই চন্দ্র কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও
তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর এবং
ক্ষুদ্র কমল-কোরক একেরই উপমাগুল, কিন্তু
ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িয়, কদম্ব, করিকুন্ত
এই বিবম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর
ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ
হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈবম্য থাকাই স্বাভাবিক
উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণীকুল-
চরণবিশ্বাসের অমুকুরী। আবার যে-সে-হাতীর
গমনের সহিত এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য
নির্দেশ করা বিধেয় নহে। যে হাতী হাতীর রাজা,
সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি
তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর
যাইতে পারে, অর্থাৎ কোন পশু তত পারে না।
যাহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাহারা এই
গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন?
যে দিকে রেইলওয়ে হয় নাই, সে দিকে
বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে
কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত
ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর
শ্রায় সুন্দর বস্ত্র আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক,
কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাব
প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুম-
মালিকার শ্রায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে
কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি
কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম, বর্ষার উজ্জ্বল-
সলিলা চিররদ্বীপী তরঙ্গিনী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর
পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে
ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি
মানময়ী-মানবীমণ্ডলের কুহকজাল ছিন্ন করিয়া বাহির
হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে
রাঘব বোয়াল পড়িলে যেমন ভাল ছিঁড়িয়া পলায়ন
করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র
মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে
জালা ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন

করিয়াছি, দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে
পারিলে যেমন উদ্ধ্বাসে পলায়ন করে, আমি
তেমনি দোড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই
আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ আফিম দেবী!
তোমার কোঁটা অক্ষয় হউক! তুমি বৎসর বৎসর
সোনার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা থাইতে
যাও; জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা
সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক! তোমার
নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলা-
কান্তকে পায়ের রাখিও। আমি তোমার রূপায়
সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই
চারিট কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক
পুরুষও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি
নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া
গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে,
ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্মিকসমাজ, বিদ্বান-সমাজ
শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর
মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল।
ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্মিক-সমাজ, বিদ্বান-সমাজ
আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না;
গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্যবিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য
স্বীকার করেন। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা
স্বীকার পাইয়াও, রূপের টাকা স্ত্রীলোকের মস্তকে
দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা
স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিরুপ। হে মানময়ী
মোহিনীগণ! কুটিলকটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া
আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না, কালসপ-
বিনিমিত বেণী দ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না,
জ-বন্ধুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে
বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা
করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-
ফাদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া,
তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্-
ছার! তোমাদের নখের নোলক খসিয়া পড়িলে
যাহুয খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের
একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে
লাগে, তবে তাহার হাতপা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে।
অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের
তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিশ্বাস হইতে
পারে—যথা নখর-নিকর-হিমকর-করশ্চিৎ-কোকিল-
কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা—

শ্রীভীষ্মদেব।

* কোপনিকস P D

প্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্বাদেবীর স্বখময় স্ববর্ণময়ী প্রতিমা তাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উত্তত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্ত দেবতার প্রকৃত মূর্তি পরিত্যাগপূর্বক বিকৃত প্রতিমূর্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দস্তুর প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণ লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চকুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্টপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপে যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জ্ঞাত লালায়িত হয় না। যে বস্তুতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিনয়ে আপনাতত্ত্ব-মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্বদা আপন আপন রূপ ঝড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক-জগন্নাথকে দোলায়। যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাইকানরূপ নানা ফলফুল পশু-পক্ষিবিশিষ্ট বাগানের ঘোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনরফাঁসির দড়ী টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্ত্রীপায়ী বান্ধকদিগের ভীতিবিধান করে। যে অলঙ্কার বিনা আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সম্ভব থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়; অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য-বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বুকের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কটের যেমন সুন্দর তাত্রচূড়া ও পক্ষসকল আছে, কুক্কটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল “বিদ্যাসুন্দর”-কার! তোমার মনে কি এই তত্রটি উদ্ভিত হইয়াছিল? এই জন্তই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে?

সৌন্দর্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু রূপাক্র তামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। বুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পয়তাল্লিশে পুরুষের যে স্ত্রী থাকে, বিশ-পঁচিশের উদ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর তায়, ইন্দ্রধনুর তায় মুহূর্তের জ্ঞাত না হউক, অত্যল্পকালের জ্ঞাত সন্দেহ নাই। যাহারা রূপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি,—আমার জীবনে যোর দুঃখ এই যে, অমব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যরূপ বুকড়ী চালের তাত, প্রণয়কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য যায়? শেষে বেশ-ভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদা-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্যগর্ভিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জ্ঞাত কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের তায়

উন্নত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভ্রমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায়, অল্পরূপ-নেত্রে কামিনীকুলের রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, “যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ভোম।” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুণ্ঠিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে, মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জন নাখাইয়া দেখিব, পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিশোহন পদার্থ-পরস্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্তিকে সে মনোহর দেখে; কর্কশ স্বরকে সে মধুর্য্য ভাবে; প্রেতিনীর অন্ধভঙ্গীকে মৃদু মন্দ মারুতে দোহলায়মানা ললিতলব্দলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এ জন্তই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর, এ জন্তই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিভাল-চোখের আদর। এ জন্তই কান্ট্রিদেশে ফুল ওষ্ঠাধরের আদর। এ জন্তই বাদ্রালা দেশে উচ্ছ্বিচ্ছিত্রিত শিশিকলসিত চাঁদবদনের আদর। এ জন্তই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ছায় মনের কথা মুখে আনিতে, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গৃঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীর পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিণী?

রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়াছে। সকলেই তবে, রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন,

রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাদনাবর্ণের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যৌবনাগুণীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, একথা আর আমি শুনিতে চাই না। অনেক দিন শুনিয়াছি, শুনিয়া কান কালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মৃত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ করিয়া জননী সন্তানের পালন করেন, যাহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনী-কুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতিপুত্রের জন্ত জীবন বিসর্জন, ধর্ম্মের জন্ত বাহসুখ বিসর্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দূর বুঝিয়াছেন যে, বিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যৌবনবর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে সহমরণ-প্রবৃত্তা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হতাশনামধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন, আশ্তে আশ্তে বহি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতেছেন বা বলিতে সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পানকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায় ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অন্ধনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়। তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্বের নীড় আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরোহিত্যগণ—তোমরা এ

বন্দদেশের সার রত্ন। তোমাদের মিছা রূপের বড়ায়
কাজ কি?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস—বিবাহের মাস। আমি এলা
বৈশাখে নদীবাঁধ ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ
দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বর-কন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া
রাখিতেছি।

মল্লিকাফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসান-
প্রায়, কলিকাতা-কন্যা বিবাহযোগ্য হইয়া আসিল।
কন্যার পিতা বড়লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে
আবার অনেকগুলি কন্যাতারগ্রস্ত। স্বপ্নের অনেক
কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই।
উজ্জানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু বড়
উঁচু, স্থলপদ্ম অতদূর নাগিল না। জবা এ বিবাহে
অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যা-কর্ত্তা
পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড়
দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ
অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকাবৃক্ষ-
সদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—

“গুণ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে?”

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, “আছে!”
ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “গুণ গুণ গুণ
গুণ! গুণাগুণ! মেয়ে দেখিব।”

বৃক্ষ শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না, অবগুণ্ঠনবতী
কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া
বলিলেন, “গুণ! গুণ! গুণ! দেখিতে চাই।
ঘোমটা খোল।”

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না।
বৃক্ষ বলিলেন, “আমার মেয়েগুলি লাজুক। তুমি
একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।”

ভ্রমর ভেঁা করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া
রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এ
দিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া
তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, “দিদি,
একবার ঘোমটা খোল—নইলে বর আসিবে না—
লক্ষী আমার, চাঁদ আমার, সোনা আমার” ইত্যাদি।
সে কতবার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ

ঘুরাইল, কতবার বলিল, “হান্দিদি, তুই যা।”
কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধভাবে মুখ হইয়া মুখ
খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভেঁা করিয়া
রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন
দিলেন। কন্যার পরিমলে মুখ হইয়া বলিলেন, “গুণ
গুণ! গুণ! গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। বর
মধু কত?”

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, “ফল দিবেন, কড়ায়-
গুণায় বুঝাইয়া দিব।” ভ্রমর বলিলেন, “গুণ! গুণ!
আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?”

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, “তাও হবে।”
ভ্রমর—“বলি, ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে
হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ! গুণ! গুণ।”

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া সকল শাখা
নাড়িয়া বলিল, “আগে বরের কথা বল—বর কে?”

ভ্রমর—“বর অতি সুপাত্র। তাঁর অনেক
গুণ—ন—ন।”

“কে তিনি?”

“গোলাবলাল গদ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—
গুণ—ন—ন।”

এই সকল কথোপকথন মল্লিকা শুনিতে পায়
না, আমি কেবল আফিম-প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ
পাইয়াই এ সকল শুনিতোছিলাম। আমি শুনিতে
লাগিলাম, কুলাচাৰ্য্য মহাশয় পাখা বাড়িয়া, ছয়
পা ছড়াইয়া, গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে-
ছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাববংশ বড়
কুলীন; কেন না, ইহার “ফুলে” মেল। যদি
সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব আ
কেন না ইহার সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালী সন্তা
তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁচা
আছে, কোন্ ফুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির
করিয়া ভেঁা করিয়া উড়িয়া গিয়া গোলাব বাবুর
বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব তখন বাতাসের
সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া
লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া
আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল।
ভ্রমর বলিল, “আজিকালি ফুটিবে।”

গোন্ধূল লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে নহবত
বাজাইতে আরম্ভ করিল; যোমাছি সানাইয়ের
বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে
যাইতে পারিল না। যত্নোত্তেরা বাড়ি ধরিল;

আকাশে তারাভাজি হইতে লাগিল, কোকিল
আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরষাত্র
চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাকসানে
অস্থস্থকায় বলিয়া, আসিতে পারিলেন না, কিন্তু
জবাগোষ্ঠী—স্বেত জবা, রক্ত জবা, জ্বরদ জবা
প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীর দল, সেকলে
রাজাদিগের মত উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া
উপস্থিত হইল। সোঁউতি নিতবর হইবে বলিয়া
সাজিয়া আসিয়া ফুলিতে লাগিল। গরদের জোড়
পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল; বেলা ব্রাণ্ড টানিয়া
আসিয়াছিল। উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধ-
রাজের বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া গন্ধ
বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায়
লাল হইয়া আসিয়া উপাশ্রুত, সঙ্গে এক পাল
পিপড়া মোশাহেব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের
গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—
কোন বিবাহে না এরূপ বরষাত্র জোটে, আর কোন
বিবাহে না তাহারা হল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়?
কুরবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরষাত্র
আসিয়াছিলেন, ঘটকমহাশয়ের কাছে তাঁহাদের
পরিচয় শুনিবেন। সর্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন
এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি,
বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না
লইয়াছিলেন, তখন হুহু করিয়া অনেক মরদানি
করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায়
লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর,
বরষাত্র, সকলে অবাক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া
আছে। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া আমিই
বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরষাত্র
সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম কতগুলি, সকল ভগিনী,
আহ্লাদেই ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া পরিমল
ছুটাইয়া সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম
পাতার পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি
পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঁড়িয়া
পড়িতেছে। বৃথা, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি
এরোগণ স্বী-অচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম,
পুরোহিত উপস্থিত। নসীবাবুর নবম বর্ষীয়া কন্যা
(জীবন্ত কুম্মরূপিনী) কুম্মলতা সূচ-সূতা লইয়া
দাঁড়াইয়া আছে; কতাকন্তা কন্যা সম্মুখীন
করিলেন; পুরোহিত মশায় দুই জনকে এক সূতায়
গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসরঘরে লইয়া গেল। কত
যে রসময়ী মধুময়ী স্নন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া
বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর
সাদাপ্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া
উঠিলেন। রঙ্গের রাধামুখে হাসি ধরে না।
বুঁই কন্যার কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধাকে বর
তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাশা করিল; বকুল
একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে;
এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর
ঝুমকাফুল বড়মাহুকের গৃহিণীর মত মোটা মাগী,
নীল শাড়ী ছড়াইয়া জুমকাইয়া বসিল। তখন—
“কমলকাকা—ওঠ, বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও
কি, ঢলে পড়বে যে?”

কুম্মলতা এই কথা বলিয়া আমার গা
ঠেলিতেছিল; চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই।
সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? মনে করিলাম,
সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই।
সে রম্য বাসর কোথায় গেল—সেই হান্তমুখী শুভ্রশ্রিত
সুধাময়ী পুষ্পস্নন্দরী সকল কোথায় গেল? যেখানে
সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূত-
সাগরগর্ভে। যেখানে রাজা, প্রজা, পরীত, সমুদ্র,
গ্রহ, নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—
ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ছায় সব শূন্যে মিলাইবে,
সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে কি?
ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে
পারে না। তবে কি স্মৃতি?

কুম্মল বলিল, “ওঠ না, কি কচ্চো?”

আমি বলিলাম, “দূর পাগলী, আমি বিয়ে
দিচ্ছিলাম।”

কুম্মল ঘেঁসে এসে, হেসে হেসে কাছে
দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কার বিয়ে
কাকা?”

আমি বলিলাম “ফুলের বিয়ে।”

“ও পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি
কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।”

“কই?”

“এই যে মালা গাঁথিয়াছি।” দেখিলাম, সেই
মালায় আমার বর-কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড়বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদগতির কামনায় অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে। জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপমগ্ন ধরিবার জন্ত ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সূচতুর। ভোজনান্তে নিতাই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মোতাত্ত্বিকের জন্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানবচরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে।

স্মরণ্য তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিন বিস্তৃত হইলাম—তৃতীয় দিন গালি দিরাছি, এক্ষণে সে দুগ্ধ বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা-ভরসা সম্বন্ধে হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাসজলে পুষ্ট কর, সকলই বুধা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয়াদি সকলই বুধা গল্প—আকাশ-কুসুম। ছায়াবাজী! হায়, মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়! অধিনীত গোয়াল-জাতিকে কে নিস্তার করিবে? হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালিনীর কবে গোরু চুরি যাবে।

প্রসন্নের দুগ্ধ-দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ। ইহাতে সে মূল্য চাহে, কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না, আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে, গোরু গোরুর নিজের, দুধ যে খায়, তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাণ্ড-সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, বিত্তা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়।

অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন, হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন। যশ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দসামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিব খাইয়া মরিবার বাসনা করে, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলের উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই সেখানে অনবরত ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদার চ’লে আয়”—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য—খরিদারের চোখে ধূলা দিয়া রদিমাল পাচার করিবে। দোকানদার-খরিদারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে! সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞানেন্দ্রে ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদারে পরস্পরকে অসংখ্য অশুভ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম যে, সংসারে সেই যেছোছাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া বুড়ি-চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো, পুঁটি, কই, মাগুর, খরিদারের জন্ত লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে। যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্ত খাবি খাইতেছে—মেছনীর ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুলপুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো—বোঝা বিক্রী হইলেই বাঁচি।” কেহ ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো—ধন-সাগরের মিঠা মাছ, যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবিধ মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘরদ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাদা থাকে, কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাধিতে হয়—কে খরিদার সাহস করিস, আয়।

সাবধান! হীরার কাটা—নাতি বাটা—গলায়
বাধলে শাস্ত্রীকল্পী বিভালের পায়ে পড়িতে হয়—
কাটার জালায় খরিদার হ'লে কি পালায়?" কেহ
ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুটি, বিক্রী হইলে
উঠি। বোলে, বালে, অথলে, তেলে, ঘিয়ে, জলে,
যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে, সংসারের দিন
সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুটির বলে।" কেহ
বলিতেছে, "কাদা থেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে
খরিদার পাগল হয়। কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত
হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকরনা।
দেখিলাম, মাছের দালাল আছে। নাম পুরোহিত।
দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—
শুনলাম, দর "জীবন-সর্বস্ব!" যে মাছ ইচ্ছা সেই
মাছ কেন, একই দর "জীবন-সর্বস্ব!" জিজ্ঞাসা
করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন খাইবে?" "তুদিন
চারি দিন, তার পর পচিয়া গুরু হইবে।" তখন এত
চড়া দরে এমন নম্বর সামগ্রী কেন কিনিব?—
ভাবিয়া আমি মেছোহাটা হইতে পলায়ন করিলাম।
দেখিয়া মেছনীর গামছা-কাঁধে মিন্‌সেকে গালি
পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিহার বাজারে গেলাম,
দেখিলাম—এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে
দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটাকাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ
ভগ্নর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, বুনা নারিকেলের
দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদার ডাকিতেছেন—
"বেচি আমরা ঘটক-পটক-বস্ত্রগন্ধ, ঘরে চাল থাকিলে
স্বস্ত, নইলে ন-স্ব। দ্রব্য-জাতি-গুণ-পদার্থ,
বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ।
পদার্থতত্ত্ব নামে বুনা নারিকেল খাইতে কঠিন—
তাহার প্রথম ছোবড়ায় দেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম
পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্বিধ—
তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই। ইহা
অন্তোত্তাভাব; যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব;
খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসভাব; আর আমাদের ঘরে
সর্বদাই অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য,
যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাঙারে উকি
মার। দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্বিধ,—
অন্তোত্তাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসভাব আর
অত্যন্তাভাব।

শ্রীকমলাকান্ত।

বুনা নারিকেল কেনো! ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি এ
নারিকেলের শাস। ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য,
রক্ত হইল ব্যাপক, আর তুমি দিলেই ঘটল ব্যাপ্তি,
এই বুনা নারিকেল কেনো, এখনই বুঝবে। দেখ
বাপু, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা, টাকা দাও,
এখনই একটা কার্য হইবে, কম দিলেই অকার্য।
আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে
বুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার
কারণ—কিছু যদি না কেনো, তবে নারিকেল বহা
অকারণ। অতএব নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রথর তপনতপ্ত ধর্মাক্ত
ললাট এবং বাগবিতগুঞ্জানিত অধর-স্বধাবৃত্তি
দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হা তট্টাচার্য্য
মহাশয়! বুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই,
কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিব কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে, নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না, আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া
খাই।"

শুনিয়া আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া
পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেন্টেল
সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার
বুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল
বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের
অক্ষরে লেখা আছে:—

MESSRS BROWN JONES AND
ROBISON

NUT SUPPLIERS

ESTABLISHED 1757

ON THE FIELD OF PLASSEY

MESSRS BROWN JONES AND

ROBINTON

offer to the Indian public

A large Assortment of

NUTS

PHYSICAL, METAPHYSICAL.

LOGICAL, ILLOGICAL

AND

SUFFICIENT TO BREAK

THE JAWS AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
Who stand in need of Having
Their Dental superfluities
Calcutta.

দোকানদার ডাকিতেছেন, “আয় কালাবালক—
Experimental Science খাবি আয়! দেখ,
১ নম্বর এক্সপেরিমেন্ট—ঘূসি, ইহাতে দাঁত উপড়ে,
মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল
এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের
মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল
পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-সাধনে পটু—রাসায়নিক
বলে বা বৈজ্ঞানিক বলে, বা, চৌম্বকবলে,
জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—সর্বাপেক্ষা
মুঠাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা
কৃতকার্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ
প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত
আছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কেবাকর্ষণেই আমরা
কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ
দেখা যায়; যথা—বায়ুতে অন্নজান ও যবফারজানের
সামান্য যোগ, জলে জলজান ও অন্নজানের
রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে আমাদের
হস্তে মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার
দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেন্ট
করিব। দেখিবে, প্রাতিটেশনের বলে এই সকল
নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে, পার্শ্বশন
নামক অদ্ভুত শাস্তিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে
এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের
গুণে তুমি বেদনা অনুভব করিবে।”

“অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে
এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে।”

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম,
এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকান-
দারেরা লাঠী হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঘুনা
নারিকেলের গাটার উপর গিয়া পড়িলেন। দেখিয়া
ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া
মুক্তকচ্ছ হইয়া উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন।
তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল
দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে
ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “এ কি হইল?”

সাহেবেরা ইহাকে বলে “Asiatic Researches,”
আমি তখন ভীত হইয়া আত্মশরীরের কোন প্রকার
“Anatomical researches” আশঙ্কা করিয়া
সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম
বান্ধীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন!
বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর
কতকগুলি নৃশূন্য নীচ, পীচ, পেয়ারা, আনারস,
আম্র প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—
বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি
দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ
তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জ্ঞাত
তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা
করিলাম, “এ কিসের দোকান?”

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য।”

“বেচিতেছে কে?”

“আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও
আছেন। তন্মিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয়
পঞ্চাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।”

“কিনিতেছে কে?”

“আমরাই।”

বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম
—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলুপটীতে গেলাম। দেখিলাম,
যত উমেদার মোসাহেব সকলে কলু সাজিয়া তেলের
ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার
ট্যাঁকে চাকরী আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া
লইয়া ভাঁড় বাহির করিয়া তেল মাখাইতে বসে।
চাকরী না থাকিলেও, যদি থাকে, এই ভরসায় পা
টানিয়া লইয়া তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে
চাকরী নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—
আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও
প্রার্থনা—তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্যাঙি
খাইবে, তোমার চরণে তেল মাখাইব—আমার
কথার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আদর্শ,
তোমার কানে অবিরত গোসামোদের গন্ধতেল
ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি।
কাহারও কাননা, তোমার তোবাখানায় বাতী জালিয়া
দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে।
শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা
খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে
কোন কলু আফিণ্ডের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল
দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পর যশের ময়রাপটি। সংবাদপত্র-লেখক নামে ময়রাগণ, গুডেনশের দোকান পাতিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তায় লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এ দিকে তাহাদের বিক্রয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছেন। দোকানদারগণ বিনা গুডে আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সন্তাদরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা একমাত্র ফলাহার পেলেই ছাড়ে—কেহ বা বাবুর গাড়ীতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অত্র রাজপুরুষগণ মিঠাই-গুয়ালা জাজিয়া রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, খেতাব, খেলাত, নিন্ম্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্ব দিয়া একচৌদ্দা পাইতেছে না, কেহ শুধু সেলামে দেড়মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্র পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে, খাটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম, তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না, কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

“যশের পণ্যশালা।

বিক্রয়,—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা,—কাল।

মূল্য,—জীবন।

জীবন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুর্য্যশ বিক্রয় হয় না।”

পাড়িয়া ভাবিলাম, আমার যশে কাজ নাই, কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম,—দেখিলাম, সেই কসাইখানা, টুপী মাথায়, শামলা মাথায়,—ছোট বড় কসাই সকল ছুরি হাতে গোক কাটিতেছে। মহিবাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে,—হাঁগ, মেঘ এবং গোক প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোক বলিয়া এক

জন কসাই বলিল, “এও গোক—কাটিতে হইবে।” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড়বাজারে বেড়াইবার সাধ রহিল না,—তবে গ্রসন্দের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে গেলাম,—গিয়া প্রথমই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়াল,—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাড়ি লইয়া বসিয়া আছে,—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন একহাড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে মাখিতেছে,—“চক্রবর্ত্তী মশাই, রাগ করিও না। আজ আর দুধ, দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।”

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিস চড়াইতে বলিল! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের শ্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি! দেখিলাম—অনন্ত অকূল অন্ধকারে, বাতাবিষ্কৃত তরঙ্গসকল সেই শ্রোত—মধ্যে উজ্জল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—‘মা! মা!’ করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃ-সম্বোধনে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বদভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় ভূমি? সহসা স্বর্গীয় বাজে কর্ণরন্ধ, পরিপূর্ণ হইল—দ্বন্দ্বণ্ডে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—শ্লিষ্ট মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসকল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—স্ববর্ণ-মণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জগদ্ধামি—এই—স্বয়ম্ভূ—মৃত্যুকা-

রূপিণী—অনন্তরাত্ন-ভূষিতা এফণে কালগর্ভে নিহিতা।
রত্নগণ্ডিত দশ ভূজ—দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত;
তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত,
পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী
শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—
আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পায়
না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—
দিগ্ভুজা নানাগ্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র-
পৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী
বিজ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাটিকের, কার্য-
সিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতের মধ্যে
দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বদ্বপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু
সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—
ডাকিলাম, সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্বার্থ-
সাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম-অর্থ
সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।
এই ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া তোমার
পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্তজলমণ্ডল
ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিশোহিনী মূর্তি একবার জগৎ-
সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরূপিণী,
নববলুধারিণী, নবদর্পে দর্পিণী, নবস্বপ্নদর্শিনী! এসো
মা গৃহে এসো—হয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে,
দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা
করিব। হয় কোটি মুখে ডাকি, মা প্রস্থতি
অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনবাত্মদায়িকে, নগাধ-
শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ-সুন্দরী চারু-পূর্ণ-
চন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধুপূর্জিতে
সিন্ধু-মখনকারিণী! অনন্তস্রী অনন্তকালহারিণী!
শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায়
কি কি বলিয়া ডাকিব না? এই ছয় কোটি মণ্ড এই
পদপ্রান্তে লুপ্তিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে এই
নাম করিয়া হুকার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ
তোমার জন্ত পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ
কোটি চক্ষে তোমার জন্ত কাঁদিব। এসো মা, গৃহে
এসো—বাহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?
দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই
অনন্ত কালসমূদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে
সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে
বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে
ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্যায়ী বদ্বভূমি!
উঠ মা! এবার সুসজ্জা হইব, সংপথে চলিব—
তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে

—এবার আপনা তুলিব—আত্মবৎসল হইব, পরের
মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, অলস, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ
করিব—উঠ মা, একা যোদন করিতেছি, কাঁদিতে
কাঁদিতে চক্ষু গেল না!

উঠ, উঠ মা, বদ্বজননী। মা উঠিলেন না।
উঠিবেন না কি?

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কাল-
স্রোতে বাঁপ দিই! এস, আমরা দ্বাদশ কোটি
ভূজে এই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া
ধরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? এই যে
নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহার
পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহর
প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত
করিয়া আমরা সম্ভরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা
মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয়, ডুবিব,
মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা
তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দেবক-
ছাগকে ছাড়িয়ার্থে ফেলিয়া সংকীর্ণ-খজো মায়ের
কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী ঢাক
ঘাড়ে করিয়া বদ্বের বাজনা বাজাইয়া আকাশ
ফাটাইবে—কত ঢোল কঁাসি, কাড়া নাগরায় বদ্বের
জয় বাদিত হইবে। কত মানাই পৌ ধরিয়া
গাইবে, “কত নাচ গো!”—বড় পূজার ধুম
বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লুচিমণ্ডার লোভে
বদ্বপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশ-
বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি
দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে!
কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে,
কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা! মা! মা!

জয় জয় জয় জয় জয়দাত্রি।

জয় জয় জয় বদ্ব জগদ্ধাত্রি ॥

জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।

জয় জয় জয় বরদে শর্মদে ॥

জয় জয় জয় শুভে শুভদ্রি।

জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমদ্রি ॥

দেবক-দলনি, সন্তান-পালিনি।

জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥

জয় জয় লক্ষ্মী বারীন্দ্রবালিকে।

জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥

জয় জয় ভক্তি-শক্তি-দায়িকে।

পাপ-তাপ-ভয়-শোকনাশিকে ॥

মুহুর-গন্তীর-বীর ভাবিকে।

জয় মা কালি করালি অম্বিকে ॥

জয় হিমালয়-মগবালিকে ।
 অতুলিত-পূর্ণচন্দ্র ভালিকে ॥
 শুভে শোভনে সর্বার্থসাধিকে ।
 জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ॥
 জয় মা কমলাকান্তপালিকে ।
 নমোহস্ত তে দেবী বরপ্রদে শুভে ।
 নমোহস্ত তে কামচরে সদা ক্রবে ॥
 ব্রহ্মাণীজ্ঞাণি রুদ্রাণি ভূতভবে যশস্বিনি ।
 ত্রাহি নাং সর্বভূতঃখ্যেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করী ॥
 নমোহস্ত তে জগন্নাথে জনাৰ্দ্দনি নমোহস্ত তে ।
 প্রিয়াদাস্তে জগন্নাথঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥
 ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামান্তিনাশিনি ।
 নমামি শিরসা দেবিং বন্ধনোহস্ত বিমোচিতঃ ॥*

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

“শোন প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব ।”
 প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, “আমার এখন গান
 শুনিবার সময় নয়—দুখ যোগাবার বেলা হলে ।”
 কমলাকান্ত । এসো এসো বধু এসো ।
 প্রসন্ন । ছি ছি ছি ! আমি কি তোমার বধু ?
 কমলাকান্ত । বালাই ! বাট ! তুমি কেন বধু
 হইতে যাইবে ? আমার গীতে আছে—“এসো এসো
 বধু এসো, আধ-আঁচরে বসো”—
 সুর করিয়া আমি কীৰ্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন ছুধের
 কেড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আছোপান্ত
 গায়িলাম ।

“এসো এসো বধু এসো আধ-আঁচরে বসো,
 নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি ।
 অনেক দিবসে, মনের মানসে,
 তোমা-বনে মিলাইল বিধি ॥
 ইণি নও, নাগিক নও, যে হার করে গলে পরি,
 ফুল নও যে কেশের করি বেশ ।
 নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
 লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
 বধু তোমার বধন পড়ে মনে,
 আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
 আনুইয়ে কেশ নাহি বাধি ।
 বন্ধনশালাতে যাই, তুমি বধু গুণ গাই,
 ধূয়ার ছলনা করি কাঁদি ।”

* আখ্যান্তোত্তর দেখ ।

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি” মিলিল ।
 কিন্তু বান্দালা ভাষায় এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি
 শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে । যখন এই গান
 প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল,
 নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—
 মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি
 দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূত্র,
 দৃশ্যশূত্র, গুণিবী যেখান হইতে দেখা যায় না,
 সেইখানে বসিয়া, সেই মূলনীতে, একা এই গীত
 গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না, কখনও
 ভুলিতে পারিব না ।

“এসো এসো বধু এসো”*

লোকের মনে কি আছে, আমি বলিতে পারি
 না, কিন্তু কমলাকান্ত চক্রবর্তী বুঝিতে পারিল না
 যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে । যে পশু
 ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্ত পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে
 যেন কখনও কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী
 পড়িতে বসে না । আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে “এসো
 এসো বধু এসো” বুঝিতে পারি না । কিন্তু ইহা
 বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্ত হইয়াছিল—
 এক হৃদয় অতের হৃদয়ের জন্ত হইয়াছিল—সেই
 হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা
 মনুষ্যজীবনের সুখ । ইহাজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র
 তৃপ্তি,—অন্তহৃদয় কাঁমনা । মনুষ্যহৃদয় অনবরত
 হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে,—“এসো এসো বধু
 এসো ।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীররক্ষার্থ—
 মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্যে,—“এসো এসো বধু
 এসো ।” তুমি চাকরী কর, খাইবার জন্ত—কিন্তু
 যশের আকাঙ্ক্ষা কর পরের অনুরাগ লাভ করিবার
 জন্ত, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে
 মিলিত করিবার জন্ত । তুমি যে পরোপকার কর,
 সে পরের হৃদয়ের ক্রেশ আপন হৃদয়ে অন্তর্ভূত কর
 বলিয়া । তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত
 কার্য্য হইল না বলিয়া, হৃদয় হৃদয়ে আসিল না
 বলিয়া । সর্বত্র এই রব—“এসো এসো বধু এসো ।”
 সর্বকর্ম্মের এই মন্ত্র,—“এসো এসো বধু এসো ।”
 জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ । বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে
 ডাকিতেছে,—“এসো এসো বধু এসো ।” সৌর-
 পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে,—“এসো এসো বধু
 এসো ।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে,—“এসো

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে
 হইবে ।

এসো বঁধু এসো।” পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে,—“এসো এসো বঁধু এসো।” জড়পিণ্ড-সকল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু—সকলেই এই মোহ-যন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে,—“এসো এসো বঁধু এসো।” জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—“এসো এসো বঁধু এসো।” কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

“আধ-আঁচরে বসো”

এই তৃণশম্পসমাচ্ছন্ন কণ্টকাদিতে কৰ্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঙ্কিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়বরণের অর্ধেক উপবেশন কর। কুশ-কণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্ত আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো! যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর—আধ-আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব, দূরে আসন গ্রহণ করিও না—এই আমার শরীর-সংলগ্ন অঞ্চলার্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্কিনীত! হে সাজসজ্জা-বিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শাস্তিপূরে বন্ধাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্ন জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত, অর্ধেক তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্ধেক বাঙ্কিতকে বসাও। তুমি মূৰ্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূৰ্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—

“এসো এসো বঁধু এসো—আধ-আঁচরে বসো, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।”

কে কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক বন উপার্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আশ্রয় দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্ত প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আশ্রয়শোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপহৃৎষয় তুমি ইহ-জীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলাট ফুটে, ফুলাট দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল বারে, তুমি সেইখানেই রূপের অম্লসন্ধান ফিরিয়াছ—যেখানে বালক প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভারে তাদ্রা তাদ্রা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত-স্মৃতিত্যাগমধ্যাহ্ন-পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ

করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধান ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুমুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে, পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে নুকাই, নদী শুকাই, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র মিলিয়া যায়? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের হৃদদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সূত্র—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত। পরিতৃপ্তি-রাক্ষণী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্তনশীল সংসার আর এই অতৃপ্ত নয়ন স্বজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি; জগৎ পরিবর্তনশীল, নয়নও অতৃপ্ত, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ-সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না, কেন না, দেখা কেবল নয়নের নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্বশরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে? নয়নে যে পুলক আছে।

“অনেক দিবসে মনের মানসে তোমা-ধনে মিলাইল বিধি হে।”

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্তই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছেন। নহিলে, কাল অপরিমেয়, গম্ভীর দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি, কিন্তু দিন-রাত্রি পরিবর্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্তকাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বুদ্ধাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনন্তরূপ হইত—জীবনযাত্রা দুর্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র

স্বপ্নের পথ আমাদের হৃৎকের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়া হৃৎকী জন দিবস গণনা থাকে। দিবসগণনা হৃৎকী-বিনোদন! কিন্তু এমন হৃৎকীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস গণনা তাহার পক্ষে চিত্ত-বিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—স্বাধীন, আশাহীন, উদ্বেগশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, আমি কি জন্ম দিবস গণিব? এই সংসারসমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসারকাতার আমি ঘূর্ণমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিম্নলব্ধ বৃক্ষ, সংসারাকাশে আমি বারিষ্মত বেষ, আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক হৃৎকী, এক সম্ভাপ, এক ভরসা আছে। ১২০০ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বন্দে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইত দিন গণি। যে দিন শতদশ, অষ্টারোহী বন্দ জয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া শতবার গণি। কৈ, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ? বাহা চাই, তাহা মিলাইল কৈ? মনুষ্যজন্ম মিলিল কৈ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কৈ? এক্য কৈ? বিজ্ঞা কৈ? গৌরব কৈ? ত্রিহর্ষ কৈ? ভট্টনারায়ণ কৈ? হলান্দ কৈ? লক্ষ্মণসেন কৈ? আর কি মিলিবে না? হায় সবাইই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

“মনি নও মাণিক নও যে,
হার ক’রে গলে পরি—”

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত। যদি রূপের শরীর প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে,—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মনি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বদ্ধভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে

পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় স্বর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপ, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জল মণি।

“আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।”

প্রথমে আহ্বান,—“এসো এসো বন্ধু এসো” পরে আদর,—“আধ আঁচরে বসো,” পরে ভোগ—“নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।” তখন সুখভোগ-কালীন পূর্ববৃত্তি—“অনেক দিবসে মনের মানসে তোমা-ধনে মিলাইল বিধি।” সুখ দ্বিবিধ—সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,—“মনি নও মাণিক নও যে, হার ক’রে গলে পরি।”

পরে সম্পূর্ণ সুখ—

“আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।”

সম্পূর্ণ অসহ সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য; মানসিক অস্থিরতা। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া আমি কোথায় ফিরিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব! এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব। এ জগৎসংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; যেক হইতে যেক পর্যন্ত সুখের তরঙ্গে নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, তাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাদ্দালীর অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাদ্দালীর অধিকার নাই। গোপীর হৃৎকী, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের হৃৎকী, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাদ্দালীর অধিকার নাই—কিন্তু হৃৎকের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাদ্দালীর মর্শ্বোক্তি। আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নব-প্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শূদ্রদানি পর্যন্ত সকলই কাতরোক্তি, সম্পূর্ণ সুখে স্বর্গীও সুখকালে পূর্ব-হৃৎকী স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি

করে। নহিলে স্মৃতির সম্পূর্ণতা কি? হৃৎস্বত্বি
ব্যতীত স্মৃতির সম্পূর্ণতা কোথায়? স্মৃতিও হৃৎস্বয়—

“তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন-পানে,
আনুহিলে কেশ নাহি বাধি।”

এই কথা স্মৃতি-হৃৎস্বয়ের সীমা-রেখা। যাহার নষ্ট
স্মৃতির স্থিতি জাগরিত হইলে স্মৃতির নিদর্শন এখনও
দেখিতে পায়, সে এখনও স্মৃতি—তাহার স্মৃতি
একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু তাহার
প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন
আছে—মনে করিলে সে সেই স্মৃতিভূমি-পানে
চাহিতে পারে। যাহার স্মৃতি গিয়াছে—স্মৃতির
নিদর্শন গিয়াছে—বন্ধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে,
এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই হৃৎস্বয়, অনন্ত
হৃৎস্বয় হৃৎস্বয়। বিধবা যুবতী, মৃতপতির যত্নরক্ষিত
পাছুকা হারাইলে যেমন হৃৎস্বয় হৃৎস্বয় হয়, তেমনি
হৃৎস্বয় হৃৎস্বয়।

আমার এই বঙ্গদেশের স্মৃতির স্থিতি আছে,
নিদর্শন কৈ? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব,
ঐহর্ব,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য—ভারতের অধীশ্বর
নাম, গোড়ী রীতি, এ সকলের স্থিতি আছে, কিন্তু
নিদর্শন কৈ? স্মৃতি মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন
দিকে? সে গোড় কৈ? সে যে কেবল যবন-সাম্রাজ্য
ভয়াবশেষ! আধারাজধানীর চিহ্ন কৈ? আর্থের
ইতিহাস কৈ? জীবনচরিত কৈ? কীর্তি কৈ?
কীর্তিস্তম্ভ কৈ? সমরক্ষেত্র কৈ? স্মৃতি গিয়াছে,
—স্মৃতি-চিহ্ন গিয়াছে, বন্ধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও
গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে?

চাহিবার এক শ্রাশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ।
সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাদলা জয় করিয়াছিল।
বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্রাশান-ভূমির
প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম
বেড়িয়া অজাপি সেই কলধৌতবাহিনী গদা তর-
তর রব করিতেছেন, তখন গদাকে ডাকিয়া
জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়?
তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই স্নাতা কোথায়?
তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই
আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্ত সিংহল,
বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বৃকে করিয়া ধন বহন
করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি
যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত
সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল
লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণ

কোথায়? সে রূপ-ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া
গিয়াছ? বিশ্বাসবাহিনী! তুমি কেন আবার
শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ?
বৃকি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীতা সেই
লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন; বৃকি কুপুত্রগণের আর মুখ
দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে
আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে
দেখিতে পাই, সাজিত বর্ষাকলক উন্নত করিয়া অশ্ব-
পদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া যবনসেনা
নবদ্বীপ আসিতেছে। কাল পূর্ব দেখিয়া নবদ্বীপ
হইতে বাদ্যলার লক্ষ্মী অন্তহত হইতেছেন। সহসা
আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ
ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে
পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহমন্দিরকণ্ঠে অর্ধব্যক্ত কেকার
অপরাক্ষ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত
হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজা-
গৃহে বাজাইবার সময় শব্দ বাজিল না; পণ্ডিত
অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা
গড়াইয়া পড়িল। যুবর সহসা বলক্ষয় হইল;
যুবতী সহসা বৈবধ্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু
বিনা রোগে মাতার কোড়ে শুইয়া মরিল। গাটতর,
গাটতর, গাটতর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল। আকাশ,
অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ষ্য, দেবমন্দির পণ্য-
বীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী-
সৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার,
আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি,
আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ
করিয়া, রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে
নির্ঝরণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই
তেজোরাশি বিলীন হইতেছে! যদি গদ্যার অতল
জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী
কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হাঁকা
হাতে বিমাইতেছিলাম। একটু মিট-মিট করিয়া
ক্ষুদ্র আলো জলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল
ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহা! প্রস্তুত হয় নাই

—এজ্ঞ হঁকা হাতে, নির্মালিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও।”

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিস তিফা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উত্তরে পাৰ্ণাণবৎ কঠিন হইয়া

বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতঃপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, “মেও।”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে; একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার। প্রসন্ন আমার জ্ঞ যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি ওয়াটার্লুর মাঠে

বৃহৎচর্য্য ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জ্জার-সুন্দরী নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ ভগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুরস্বরে বলিতেছেন, “মেও।” বলিতে পারি না,

বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যদ্ব ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল হৈছে, কেহ খায় কই।” বুঝি সে

“মেউ” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—“তোমার দুগ্ধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?”

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুগ্ধ আমার বাপেরও নয়। দুগ্ধ মন্দলার, হুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে,

বিড়াল দুগ্ধ খাইয়া গেলে তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কল্যাদারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই

মার্জ্জারী যদি স্বজাতিগণে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের স্থায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া সকাব-চিন্তে হস্ত হইতে হঁকা নামাইয়া অনেক অন্তঃসন্ধান

এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জ্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ায় কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, “মেও।” প্রথম বঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জ্জারীর বক্তব্য সকল বঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, “মারপিট কেন? স্থির হইয়া হকা হাতে করিয়া একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা

কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই

তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অন্তঃসন্ধান পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর।

বিস্তৃতত্বদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিজ্ঞানসকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বঝিতে পারিয়াছ।

“দেখ শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকার করাই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমাদের আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই

পরম ধর্মের ফলভোগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসম্বন্ধের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা

কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, ষাঁহার বড় বড় সাধ, চোরের নামে

শিহরিয়া উঠেন, তাঁহার অনেক চোর অপেক্ষাও অধামক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাভীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ

তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম রূপ ধরায়। চোর দোষী বটে, কিন্তু রূপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে রূপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

“দেখ, আমি প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমা ফেলিয়া দেয়,

জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্ত ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগেরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা মনেই নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পড়িয়া রাত্রে ঘুমায়ে না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

“দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ছায়ালাকার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহার অতি পণ্ডিত, বড় মাণ্ড-লোক, পণ্ডিতরা মাণ্ড বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাণ্ডায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্ত ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

“দেখ, আমাদিগের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে নাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জার হইয়া বৃদ্ধের নিকট বৃক্ণী ভাষ্যার সহোদর বা মূৰ্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায় লোম হয় এবং তাহার রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

“আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর ক্লেশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্ত-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুক মুখ, ক্ষীণ স্কন্ধ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয়

না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলা কান্ত, দূরদর্শী, কেন না, আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোহেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অকণ্ঠ তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ত এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

আমি আর সহ করিতে না পারিয়া বলিলাম, “ধাম! ধাম! মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ-বিশুদ্ধার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জালায় নির্বিকল্পে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মার্জার বলিল, “না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধি অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?”

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কশ্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার স্মৃতিচারণ এবং স্মৃত্যাকিকণ্ড বটে, স্মৃতির না বৃবিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম—“সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।”

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন,—“চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিসে, তুমি অত্ন হইতে তিন দিবস

—এজ্ঞ হুঁকা হাতে, নির্মালিতলোচনে আমি
ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম,
তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমত
সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও।”

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বঝিতে পারিলাম
না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব
প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিস ভিক্ষা করিতে
আসিয়াছে। প্রথম উত্তরে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া

বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতঃ-
পূর্বের যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর
অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ
অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, “মেও।”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে,
ওয়েলিংটন নহে; একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার। প্রসন্ন
আমার জ্ঞাত যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ
করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি ওয়াটার্লুর মাঠে
ব্যূহরচনার ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জ্জার-
সুন্দরী নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের
সুখ এ ভগ্নপথে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি
মধুরস্বরে বলিতেছেন, “মেও।” বলিতে পারি না,
বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যদ্ব ছিল; বুঝি, মার্জ্জার
মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল,

“কেহ মরে বিল হেঁচে, কেহ খায় কই।” বুঝি সে
“মেউ” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় করিয়া-
ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—“তোমার দুধ
ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?”

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম
না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মন্দলার,
হুঁকিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে
অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে
পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে,
বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে
যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার
অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাদারস্বরূপ পরিচিত
হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই
মার্জ্জারী যদি স্বজাতিগণে কমলাকান্তকে কাপুরুষ
বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের স্থায়
আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া সকাব-
চিন্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুরক্তানে
এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জ্জারীর
প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া
বিশেষ ভীত হওয়ায় কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু
সরিয়া বসিল। বলিল, “মেও।” প্রাণ বুঝিতে
পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া
হুকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া
মার্জ্জারীর বক্তব্য সকল বঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, “মারপিট
কেন? স্থির হইয়া হুকা হাতে করিয়া একটু বিচার
করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ,
দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা
কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা
বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা
আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও,
আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই
তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঁদা লইয়া মারিতে
আইস, তাহা আমি বহু অনুরক্তানে পাইলাম না।
তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর।
বিস্তৃত চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের
জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের
বিজ্ঞানসকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত
দিনে এ কথাটি বঝিতে পারিয়াছ।

“দেখ শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকার
করাই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার
পরম উপকার হইয়াছে। তোমাদের আহরিত দুগ্ধে
এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই
পরম ধর্মের ফলভোগী—আমি চুরিই করি আর যাই
করি, আমি তোমার ধর্মসম্বন্ধের মূলীভূত কারণ।
অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা
কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ
করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর
হয়? দেখ, ষাঁহার বড় বড় সাধ, চোরের নামে
শিহরিয়া উঠেন, তাঁহার অনেক চোর অপেক্ষাও
অধামক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই
বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের
প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ
তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে।
অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম
রূপ ধরায়। চোর দোষী বটে, কিন্তু রূপণ
ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়,
চুরির মূল যে রূপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

“দেখ, আমি প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই,
কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না।
মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমা ফেলিয়া দেয়,

জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্ত ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগোঁবর আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা মনেই নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পড়িয়া রাত্রে ঘুমায়ে না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর! হি! কে হইবে?

“দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ক্রায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঁদা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহার অতি পণ্ডিত, বড় মাতুল-লোক, পণ্ডিতরা নাচা বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মল্লম্বাজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্ত ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—হি! হি!

“দেখ, আমাদিগের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে নাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জার হইয়া বুদ্ধের নিকট বুকতী ভাষ্যার সহোদর বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায় লোম হয় এবং তাহার রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

“আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কুণ্ঠ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্ত-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, গুরু মুখ, ক্ষীণ স্কন্ধ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি হুঃখ হয়

না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলা কান্ত, দূরদর্শী, কেন না, আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোহেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অন্ধ তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ত এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম! মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ-বিশুদ্ধার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জালায় নির্বিকল্পে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মার্জার বলিল, “না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধি অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?”

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ামিক, কশ্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার স্মৃতিচারণ এবং স্মৃত্যিকণ্ড বটে, স্মৃতির না বৃবিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম—“সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।”

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন,—“চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অত্ন হইতে তিন দিবস

উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নগীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে চৈদাইয়া নারিও, আমি আপত্তি করিব না।”

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথা অনুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে,—“এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দৃষ্টিচ্যুত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পার্থক্যে তোমাকে আমি নিউগ্যান ও পার্কীরের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আক্ষিপের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অন্ন আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাতেলের আক্ষিপ দিব।”

মার্জ্জার বলিল, “আক্ষিপের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

চতুর্দশ সংখ্যা

চেকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে চেকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? খাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? লাঙ্গুলকর্ণদ্রুতমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কুবাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শূদ্রলাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্ধ্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—চেকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকারনিরত চেকিকে

আর্ধ্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্ধ্যসাহিত্য আর্ধ্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না। রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। চেকিই আর্ধ্যসভ্যতার মুখোজ্জলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডান করিতেছে। শুধু কি চেকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়—কোথায় না চেকি আর্ধ্যসভ্যতার মুখোজ্জলকারী পুত্র—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডান করিতেছে? দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্ধ্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত ইহা রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন চেকি অচিরে তাহার গয়া করিবে।

চেকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণ অনুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী; বৈজ্ঞানিক সময়—অবস্থা, কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে চেকির এই কার্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public Spirit! ‘নাবস্তনা বস্তৃগিদ্ধিঃ!’ সিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি চেকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, চেকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মত্তপান করে নাই, তথাপি পুনঃপুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহূর্ত্তঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? চেকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public Spirit? ভাবিলাম,—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন, কিন্তু কৈ, তাঁহার ত কিছুমাত্র Public Spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও, মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী স্বয়ং একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোকপ্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী গোপাঙ্গনা-কুলকলঙ্কিনী, এক দিন তাহার মদলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মদলা উর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমান। কি ভাবিয়া মদলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না, স্বীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার

উত্তর শূদ্রের একমাত্র লক্ষ্য; তখন আমি কটিদেশ দূতর বন্ধ করিয়া, সদর্পে বন্ধপরিফর হইয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোয়ী রাক্ষসী। আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়! কাজেই দৌড়ের চোটে ওচু খাইয়া, গড়াইতে, গড়াইতে, গড়াইতে, চক্রশূর্য্যগ্রহ-নক্ষত্রের ছায় গড়াইতে গড়াইতে বিবরলোক-প্রাপ্তি। “আনু থানু কেশপাশ, মুখে না বহিছে স্বাস”-হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশমধ্যে Public Spirit-রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বস্তুকরা যদি গোশূত্রা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ-নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বান্দালী-জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শূদ্রতীতিশূত্র হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি-হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়াস্তরে বলিয়াছিলাম, “অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিত গোপকন্যা! তুমি গোবৃকুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউভূষি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোয়ী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গুঁতাইও না।” প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য, “সাধারণ আত্মা” অর্থাৎ Public Spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির ও কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূট-তর্কের নীমাংসার জন্ত সন্নিহানচিন্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুর কর্ণে কে বলিল, “চক্রবর্তী মহাশয়, ইা করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখন দেখে নাই?”

চাহিয়া দেখিলাম, তরদ্বিনী, মাতদ্বিনী, দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া স্বর কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাক্ষা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রথর সূর্য্যকিরণে

প্রভাসিত হইল! ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ। ঐ রমণী-পাদপদ্ম। ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে! উঠিয়া পড়িয়া ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই মাতকোটি বান্দালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ। এস মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব? কাসার মূল পরাই।

আর তাই ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়েলাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ভে শুঁড় লুটাইয়া লেজ উচু করিয়া ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিজ্ঞার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে ধাত্য, পুরস্কারের মধ্যে সেই রাক্ষা পা—আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে না কি? ঘরে থাকিয়া না কি মধ্যে মধ্যে কুণীর হও? আর তাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতার সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোকে, অমরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি-রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি না কি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান? ধন সাধ্য তাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? খনসীবার সস্ত্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাঙ্গী নাপিতানী একখানি ভাদ্রা চালাব্দ রাখিয়া উত্তরাধিকারী-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ধরখানির এমন অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি, কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে, সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাশের উপর পড়িয়া আফিস চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল, জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসারে কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী, সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া

হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমীদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হুৎপিও গুড়ে পিষিয়া নতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া, সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন, কোথাও আইনকারকঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গুড়ে পিষিয়া-ভাদ্রিয়া বাহির করিতেছে—আইন, বিচারকঢেঁকি সেই আইনগুলি গুড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভালমানুষের দেহান্ত। বাবু-ঢেঁকি বোতল-গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছে—পিলে, যকুৎ; তাঁর গৃহিণীঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজারখরচ পিষিয়া বাহির করিতেছে—অনাহার! সর্দাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম, লেখক-ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মূণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্বলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি; কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ-ধাত্ত পিষিয়া দপ্তর-চাউল বাহির করিতেছি। “মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল, এ চাউল মন্থন্যালোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—“অশ্বমেনোরথে” স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “আপত্তি কি? পুরস্কার চাই কি?”

আমি। উর্কশী, মেনকা, রস্তা।

দেবরাজ। উর্কশী মেনকা পাইবে না। আর

যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক—আটটার হিসাবে।

আমি হুশ্চ-বলিলাম, “কি ঠাকুর, ষষ্ঠরস্তা? সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।”

স্বষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্শিশ হুকুম করিলেন, এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জগু উর্কশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ—আর প্রসন্ন দাঁড়াইয়া চাঁৎকার করিতেছে—“নেশাখোর”, “বিটলে”, “পেটার্থী” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্কশীকে বলিলাম, “বাইজী, এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।”

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

১। কি লিখিব?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুত বদ্বদর্শন * সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেশু—

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, গাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৩নসীধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোস-নবীশ জুয়াচোর লোক, আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনা মূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনা মূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত-প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরি কথা আমি এত দিন জানিতাম না, দৈবাধীন একটি জোড়া জুতা কিনিয়া এ সম্বন্ধ পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা জোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণ-যুগলের ব্যবহার্য পাদুকাদয় গুণন করিতেছে। মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী-ধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বদীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, “বদ্বদর্শন।” তিত্তুর লেখা আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর।” তখন বুঝিলাম যে, আমারই এ পূর্বজন্মাজিত স্মৃতির ফল।

* কমলাকান্তের দপ্তর ‘বদ্বদর্শনে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি ‘বদ্বদর্শনে’ প্রকাশিত হয়, তখন সম্ভাব্যবাহু ইহার সম্পাদক।

আরও একটু কোতুহল জন্মিল। বদ্বদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয়, বদ্বদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?” তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মন্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “বোধ হয়, বদ্বদেশ দর্শন করাই বদ্বদর্শন!” আমি তাঁর পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অত বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল;—অত বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম, শব্দটি “বদ্বদর্শন” অর্থাৎ বাদ্দালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুপাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অত এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বদ্বদর্শনকে পূর্ববাদ্দালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, ইহার অর্থ পূর্ববাদ্দালা-দর্শন করিবার বিধি, অর্থাৎ A Guide to Eastern Bengal; এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বদ্বদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্তের মাসিক পিণ্ডান হইয়া থাকে। এফণে আবার শুনিতেছি, কোন ধর্ম্মদর ঐ দপ্তর-গুলি নিম্ন প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বদ্বদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি কমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহ-জগতে অত্মাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এফণে কি জ্ঞাত আপনাকে অত পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, “ত্রিপ্রীতনদীবাণ” লিখিয়াছি—অর্থাৎ আমার নদীবাণ ত্রিপ্রীতনদীবাণে বিনীত হইয়াছেন। তরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয়-ত্রিপ্রীতনদীবাণে পৌছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জ্ঞাত আপনি খোসানবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিস পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটা প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বিভক্তি করিবেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা

বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে গোটাকতরু কথা জিজ্ঞাস্য আছে। এ কমলাকান্ত কলে ফরমাসেসমত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিকসের দরকার? কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ব্যবহার দিব? বিজ্ঞান-শাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব-রসে আপনি সুরসিক? স্থল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য আপনি গল্প দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার-সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও অষ্ট্রিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশন সংগ্রহ করা হইয়াছে, আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই! কিন্তু সেই সকল ভাষায় কোটেশন আমি অচিরে প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরুবিষয়ে আপনার আকাজ্জনা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোসানবীশ মহাশয়ের পুত্র, যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন, * তাঁহাকে আপনার শরণ থাকিতে পারে। তিনি এফণে রুতবিত্ত হইয়াছেন। এম, এ, পাশ করিয়া বিহার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরুবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইহুদের বই চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ছাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন, পুরাতন পেনী মেগেজীন হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথকৃত এনিমেটেড জেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত ও জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দেববিজ্ঞানে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ

* ইউ টিল ইট—আই।

পুঁকুরটিও নাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধৃত ধৃত করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাদালা সাহিত্য-সমালোচনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত হার্ট স্পেনসরের মতখণ্ডন আছে এবং ডার্বিন যে বলেন যে, মাধ্যাকর্ষণবলে পৃথিবী স্থিরা আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালভী-নাথন হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে! স্মরণ্য এখানি মোটের উপরে তারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন বাদালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু-বিষয় ছাড়িয়া লঘু-বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোসনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরস্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,— তাঁহার পিতা বিজাপুরের রাজা ভীমসিংহ, আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরস্তা নায়কের বৃকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোহস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আত্ম ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে এবং অত্যাচার “নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ” নিষ্কম্প করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং আমি শপথপূর্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা “হা সখি!” এবং তেরটা “কি হলো!” সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অত্যাচার অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোসনবীশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না, ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইকোট বা জিল্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার

কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না, আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোসনবীশের ছানা জীমুতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু-গুরু সব ছাড়িয়া, খোসনবীশী রচনা ছাড়িয়া সাফ কমলাকান্তি চন্দে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার গুণীত ছাইভস্ম বাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিদ লইব। ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—একতিল ছাড়িব না।

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

পলিটিক্স

শ্রীচরণে, আফিদ পাইয়াছি। অনেকটা আফিদ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেশু। আপনার শ্রীচরণ-কমলেশুগলে—আরও কিছু আফিদ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলেশুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি গুণ হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অত্যাচার কিছু পলিটিক্স কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্স বাঁড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়?

আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স সবজ্যেষ্ঠরূপী বামা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ফুজজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিদ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা না খোসামুদে, না জুরাটোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন। কোথায় আমার এমন স্থলবন্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আফিদের জ্ঞান আমি আপনার খোসামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন

সার্থপর চাটুকার অত্যাঁপি হই নাই যে, পলিটিক্‌স্‌ লিখি। থিক্‌ আপনাদের সম্পাদকতায়! থিক্‌ আপনাদের আফিসদানে! আপনি আজও বসিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্‌য় নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুব্ধ হইয়া, এক পতিতবৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বদ্বন্দর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিত-ছিলাম! কি করি। ভরিতাক আফিস্‌ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলিমিশান ললিত বিচলীচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্‌স্‌ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্‌স্‌বিকারশূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম, তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্নচিত্তে লোকের এই পলিটিক্‌স্‌-প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্ধা ঘটে,
ইচ্ছা বটে, ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্‌—ইণ্ডায় ইণ্ডায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্‌; কিন্তু বোবার বাকচাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের জ্রতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শন-লালসার মত, হিন্দু বিশ্ববার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার ধ্বংস-বাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী নাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্‌ নাই। “জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!” ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্‌স্‌। ভক্তি অত্র পলিটিক্‌স্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিত-ছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিব কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুকুর তাহা দেখিল।

দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ফুৎ মনে জিহ্বা নিদ্রিত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংশ্রপাত্রে কুসুম-নামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ানোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়-নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্‌—এই কুকুর ত পলিটিশ্‌য়! তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুকুর পাঁকা পলিটিক্‌কেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক,—কুকুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া হা হা করিয়া ইপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল,—তাহার পলিটিক্‌কেল এজিটেশ্যন সফল হইল—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল! কুকুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্নত হইয়া তাহা চর্কণ, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকটক সম্বন্ধে এই স্মৃহং কার্য উত্তররূপে সমাপন হইল, তখন সেই সূচতুর পলিটিশ্‌য়ের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশ্‌য়ন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড়তৈতুল মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে—কুকুরপানে আর চাহে না; তখন কুকুর একটি cold move অবলম্বন করিল, জাত পলিটিশ্‌য়—না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতে কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মুহু মুহু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, “হে রাজ্যবিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।” তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই, এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুত্রদর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুখাপান করেন, কার্ডিনেলের

উলঙ্গী বা কাডিনেল জেরেজ যে স্থখে কাডিনেলের টুপী পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই স্থখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কনুগুহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক ম্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া, কনুপত্নী রোষ-ক্ৰমায়িতলোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া দান্দুল সংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টগোচর হইল, যতক্ষণ ক্ষীণভাবী কুকুর উদরপূত্তর জন্ত বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোল-বিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া ছাবনা খাইতেছিল—বলদ বুকের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূল কায় দেখিয়া মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার নৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দূরীভূত করিয়া কনুগুহিণী এই দম্ভ্যতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বুকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন।

কিন্তু ভগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না এবং কনুগুহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্র-ভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কনুপত্নী তখন রণে ভদ্র দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৃষ অবকাশ মতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে ছলিতে স্বহানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিকস্। দুই রকমের পলিটিকস্ দেখিলাম, এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিবমার্ক এবং গর্শাকক্ষ এই বুকের দরের পলিটিক্সন; আর উলঙ্গী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিক্সন।

ভূতায় সংখ্যা

বাদালীর মহুয্য

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—
লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে
কুড়ে বসে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে
গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুতিয়াছি। মনে

করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের বেহ নাই—এই
ফুলগুলি আমার সখাসখী হইবে। খোশানোদ
করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না, টাকা ছড়াইতে
হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন-যোগানগোছ
কথা বলিতে হইবে না, আপনার স্থখে উহারা
আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে, কান্না নাই,
আমোদ আছে, রাগ নাই; মনে করিলাম, যদি
প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ভ্যাগ করিয়াছে, তবে
এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম,
মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে ফুটন্ত
ফুল দেখিয়া ভোমরার দল—নাখে নাখে বাঁকে
বাঁকে ভোমরা, বোলতা, মৌমাছি, বহুবিধ রসাপেক্ষী
রসিকের দল আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত
হইলেন। তখন গুন গুন তনু তনু বান বান ঘ্যান
ঘ্যান করিয়া হাড় জালাইতে আরম্ভ করিলেন।
তঁাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে
মহাশয়গণ! এ সভা নছে, সমাজ নছে, এসোসিয়েশ্যন,
লীগ, সোসাইটী, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নছে—
কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান
ঘ্যান করিতে হয়, অতঃপর গমন করুন—আমি কোন
রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়তঃ করিতে প্রস্তুত নহি,
আপনার স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুনগুনের দল
তাহাতে কোনমতে সন্মত নছে—বরং ফুলগাছ
ছাড়িয়া আমার কুটারের ভিতর হস্তা করিতে আরম্ভ
করিয়াছে। এইমাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে
প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিদ্দ ফুরাইয়াছে) এমত
সময়ে এক ভ্রমর—কুচকুচে কালো—আসল, ভেঁ
করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে
ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড়
স্বরসিক—বড় সন্ন্যাসী—তঁাহার ঘ্যানঘ্যাননিতে
আমার সর্কাদ জুড়াইয়া যাইবে—আমারই ফুল-
গাছের ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া, আমারই
কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান? আমার রাগ অসহ
হইয়া উঠিল, আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণ, বিঘূর্ণ,
সংঘূর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ বক্র গতিতে তালবৃন্তাশ্র
সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন,
প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে
লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী দপ্তর-মুক্তাবলীর
প্রণেতা, কিন্তু হায় মহুয্যাব্য! তুমি অতি অসার!
তুমি চিরদিন মহুয্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন

তখন ধূল্যবলুষ্ঠিত-শরীর দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “হে দ্বিরেফগত্ম ! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ ? দেখ, আমি এই বদন্দর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আশঙ্কি আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিষ কর ? আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতে-ছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম, “হে ভুদ ! হে অনঙ্গরদ-তরঙ্গবিক্ষেপ-কারিন্ ! হে হৃদান্ত-পাষণ্ড-ভণ্ডচিত্ত-লণ্ডভণ্ডকারিন্ ! হে উত্থানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ ? হে ভুদ ! হে দ্বিরেফ ! হে ফুটপদ ! হে অলে ! হে ভ্রমর ! হে ভেঁ ! ভেঁ !”—

ভ্রমর রূপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন
 গুন গুন করিয়া গলা দুরন্ত করিয়া বলিতে লাগিল
 —আমি অহিফেন-প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে
 পারি—আমি স্থিরচিন্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভূদরাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র ! আমার উপর এত চোট কেন ? আমি কি একাই ঘ্যানে ঘ্যানে ? তোমার এ বদভূমে জনাগ্রহণ করিয়া

ঘান্ ঘান্ করিব না ত কি করিব? বাদ্গালী
হইয়া কে ঘান্‌ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাদ্গালীর
ঘান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অস্ত ব্যবসা আছে? তোমাদের
মধ্যে যিনি রাজা-মহারাজা কি এমনি একটা কিছু
মাথাখ পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলুভিউয়ের
ঘান্ ঘান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি উমেদারীর
ইচ্ছা রাখেন, তিনি গিয়া রাজি-দিবা রাজদ্বারে ঘান্
ঘান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরীর উমেদ-
ওয়ার, তাঁর ঘান্‌ঘ্যানানির ত আর অস্ত নাই।
বাদ্গালী বাবু যিনি দুই চারিটা ইংরেজী বোল
শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত
হইয়া দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘান্
ঘান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার
সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াইবার সময়ে, দিনে,
রাত্রে, প্রাতে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাহ্নে—ঘান্
ঘান্ ঘান্! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন
হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সন্দী
ঘান্‌ঘ্যানে! সত্যমিথ্যার সাগরসন্ধানে প্রাণতঃস্মান
করিয়া উঠিয়া যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর
বিড়ে গ্রাথায় সরকারী জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ,
ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটী, মুন্সেফ, সেইখানে গিয়া
সেই পেশাদার ঘান্‌ঘ্যানে ঘান্‌ঘ্যানানির ফোয়ারা
খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘান্‌ঘ্যানানির
চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাভলে ছেলে বড়
জমা করিয়া ঘান্‌ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন
দেশে বৃষ্টি হয় মাই—এসো বাবু ঘান্ ঘান্ করি;
বড় চাকরী পাই না—এসো বাপু ঘান্ ঘান্ করি—
রমাকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু স্বহৃদগার্থ ঘান্
ঘান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না;
তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হুণ্ডায় হুণ্ডায়, মাসে মাসে,
দিন দিন ঘান্ ঘান্ করেন; আর তুমি যে বাপু,
আমার ঘান্‌ঘ্যানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও
কি করিতে বসিয়াছ? বদ্বদর্শন-সম্পাদকের কাছে
কিছু অফিদের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘান্ ঘান্
করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

“তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত !

তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি না—মধু-সংগ্রহ করি, আর হল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ পার! একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল কাঁধে নেয়ের মত দিবা-রাত্রি ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌। একটু বকাবকি লেখালেখি কম

করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের ত্রীবুদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ, হল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের হলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হল। সে যাক, দেখ, রসনাকণ্ঠের রোগ জন্ম কাজে মন যায় না—জিবে কাষ্টকি দিয়া যা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভাল লাগে না।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ তেঁ। করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবুদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্ত দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবুদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ঘটপদের—একখানি না, দুখানি না, ছয়খানি পা। অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবুদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু-সংগ্রহের আশাটা রহিল। বৃদ্ধদর্শন-পুষ্প হইতে অহিফেন-মধু সংগ্রহ হইবে, এই ভরসায় প্রাণধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়ো বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিস পৌছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ বাহা লিখিলাম, তাহা বিস্মারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন-প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়—আপনার মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে বুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়া কিছু পড়ে

না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক ছুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব তা বলিতে পারি না; বৈভরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই, আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবিদাওয়া নাই, মেয়াদি পাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মেয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি-বকেয়া আদায় উম্মল করা হয় নাই, তাহার জন্ত কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া কারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অন্যবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি, এমত নহে—আমি বুড়া, না হয় বুবা, দুইয়ের এক, স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাহারই বয়সটা একটু দোঁটানা রকম, যারই দ্বারা পূর্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই ভিজ্জাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া? আপনার কেশগুলি হয় ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তমালার লজ্জাশূল, হয় ত আপনার নিদ্রা অত্মাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভাষ্যাও তাহা ভাঙিতে পারে না;—তথাপি হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত আপনার কেশগুলি শাদিকালোয় গঙ্গা-যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন-মুক্তাপাঁতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা চক্ষুর প্রতারণা মাত্র, তথাপি আপনি বুবা। তুমি বলিবে, ইহার অর্থ—“বয়সেতে স্তিম নহে, বিজ্ঞ হয় জানে।” তাহা নহে,—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়; কেহ চন্নিশে বুড়া, কেহ বিষ্মিশে বুবা, কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পয়তাল্লিশে বুবা বলাহিতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ

করিয়েছে। যে পর্যায়ে বড় বলাইতে চায়, সে হয় বড়ই ভালবাসে, নয় গীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখের দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্রক পথ অতিবাহিত করিয়া প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া ক্রমাৎ দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা যায় যে, আমি বড় হইয়াছি কি না? বৃথা বা হইয়াছি। বৃথা হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই একগাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চির-প্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন! আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্যমাধা, হীরাবসান, গদ্যর ক্ষুদ্র ভরদ্বন্দ্ব ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুলকামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্রামলতা এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেননই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেননি অপরিপাণ্ড, কেবল আমারই পক্ষে নাই? ভগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানীর দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চসমা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বড়বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়স্কার আসিয়া এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বড়, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অস্ত্রে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি; অস্ত্রে কাদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহার এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আশুপ্রতারণা। কই, আমার ত আশাভরসা কিছুই নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই, তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবন-কানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে; যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃষ্ট হইয়াছে, না হয় রৌদ্র-বিশুদ্ধ বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভয়ানকিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা-মজলিসে সে উজ্জল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—

হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসা-পরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুবান্ধব কই? নাই! কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষেও নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহাতে ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখ-শোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অর্ভাষ্ট স্থানে গমন করি, তোমার আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে হে মৃগ্ময়ি! জড়পণ্ডগৌরব-পীড়িতে বস্মকরে! তোমারই বা ক্ষতি কি? আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্তকাল শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্পদিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যার কাছে সকল জালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জালা জুড়াইব।

তবে স্থির হইল এক প্রকার যে, বড় বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি? “পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজৎ” এ কোন গণ্ডমুখের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে এই অট্টালিকাময়ী লোক-পূর্ণা আপণিসমাকুল নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষায়ান পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সম্বন্ধ নাই। বিপৎকালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, “বড়! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও—” কিন্তু সম্পৎকালে কেহই বলিবে না, “বড়! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরং আমোদ-আহ্লাদকালে বলিবে, “দেখ ভাই, যেন বড় বোটা জানিতে না পারে।” তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যা শয়ন করিয়াও অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থাতেই ক্ষুদ্রহস্ত প্রসারণ করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সংবাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশ-কাস্তি, হয় ত পাপিষ্ট—পৃথিবীর পাপশ্রোত বাড়াইতেছে; হয় ত তোমারই দেষক—তুমি

কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূৰ্ত্তা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্থলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ ছিল, তুমি আজ তার অগ্রাহ। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতের এই রূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোচ্চান নির্মাণ করিয়াছিলে—বাছিয়া বাছিয়া গোলাব, চন্দ্র-মল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইগ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে ছোলা-মটরের চাষ, হারাদন পোদ গামছা কাঁধে মোটা মোটা বলদ লইয়া নির্ঝিল্লি লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পূরাইয়া, যত্নে নির্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহজীবনের অন্তর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্ত চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা—আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম, এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয় বন্ধু দাস্ত্র মিত্র যৌবনের রূপে ক্ষীতকণ্ঠে কপোতের ত্রায় সগর্ভে বেড়াইত, কত মাগী গদ্যার ঘাঁটে স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া “নমঃ শিবায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিতে, “দাস্ত্র মিত্রায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে, এখন সেই দাস্ত্র মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিত-কেশ, দম্ভহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাস্ত্রের একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাস্ত্র নামাবলীভারে কাতর, পাতে মাছের বোল দিলে পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদ্যার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোচ্চানে তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে

যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে গচল সপুষ্প পারিজাতবৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উত্থান-বায়ু জড়ী করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া গোলাব গাছ রসকেলি করিত। আর আজ গদ্যার মাকে দেখ, বকাবকি করিতে করিতে চাল বাড়িতেছে—মলিনবদনা, বিকটদশনা তীব্রসনা, দীর্ঘাদী, কৃষ্ণাদী, কৃষ্ণাদী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্কবাহ—কর্কশকণ্ঠ—এই সেই তরঙ্গিণী। আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া কালিদাসও সর্বগুণবান রঘুগুণের বান্ধকো মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস ৪০ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছেন এবং কুমার-সম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম, অজবিলাপে,—

“ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং

তব বিশ্রান্তকথং হ্রনোতি মাম্।

নিশি স্মৃগ্মিবৈকপঙ্কজং

বিরতাতান্তরবটপদম্বনম্ ॥*

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রত্ন-বিলাপে,—

“গত এব ন তে নিবর্ততে

স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।

অহমন্ত দশেব পশ্য মা-

মবিষহব্যসনের ধুমিতান।†

এটি বুড়া বয়সের কান্না।

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখন বুদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিসমার্ক, মোণ্টকে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জাশ্রাণ

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—

অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, স্মরণ্য অভ্যন্তরে ভ্রমরগুঞ্জনরহিত একটি পদ্মের ত্রায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ত্রায় পরলোকে গমন করিয়াছেন; আর ফিরিবেন না। আমি নির্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ হৃৎখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন, টিয়র মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতত্ত্বাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্ট্রেলি বুড়া—তঁাহারা মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লামেন্টের রিফর্ম এবং আয়ারিশ চার্চের ডিসেপ্টারিয়ামেন্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিশ্বযোবার সময়। আমি অন্তদন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তঁাহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তঁাহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবনে কর্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ, দ্বেষ, ভোগাসক্তি এবং জীর্ণাশ্রয় অমুসন্ধান ত্রাহ সত্যত হীনপ্রভ; এ জন্ম মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম হয় না। যৌবন-অতীতের মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লক্ষপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এ জন্ম সেই কার্যকারিতার সময়। এই জন্ম আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া কেহ স্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া মূনি-বৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্ককেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃভক্তপান অবধি উইল করা পর্যন্ত আঁবালাবুদ্ধ কেবল বিষয়বেষণে বিভ্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধান বুদ্ধকে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছি, সে আপনার জন্ম; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্ম। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্ককে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই বৃত্তি যথার্থ মূনি বৃত্তি। এই মূনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্ককেও যদি আপনার জন্ম হোক, পরের জন্ম হোক, বিষয় কার্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব, পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্ম তুলিয়া রাখিবে কেন?

শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ককে—সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্ম বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্ম অল্প কোন কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মদলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বৃত্তিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তঁাহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরদ্বীপী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিরা, বদ্বদর্শনের জন্ম ধান ভানিতেছিল—আবার শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অল্প উপায় নাই। তোমার তরদ্বীপী, হেমাঙ্গিনী, সুরদ্বীপী, কুরদ্বীপী দল আর আমাদের দিকে ঘেঁসিবে না। তোমার মিষ্ট, কোমত, স্পেন্সর, ফুরর, বার্ক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের যুগলা। আজিকার বর্ষার ছাদনে, আজি এ কালরাজির শেষ কুলগে—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্তার নিশির মেঘাগমে—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে—প্রথরবাহিনী বৈতরণীর আবর্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রধাতে আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার! প্রভো! চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র তেলা দুহুতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেমুখে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী

বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। 'আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী।' হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না তুই সেই আছিল, না আমি সেই আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি হাই, তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজা দেখি, হৃদয়! এ জগৎসংসারে—বধির অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎসংসারে, সেইরূপ আবার মনের নুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল, সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাদা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

তাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাদাবাশে মোটা আওয়াজে আর কুকুরগাংগি ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোক হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নার সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে; এখন হাসি-কান্না! হি! কেবল লোকহাসান।

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই! আনন্দের সে নদী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মদলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও একা; কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আশ্বিনা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জ্ঞাত আজিও কাঁদি; যে ফুলাট ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জ্ঞাত আজিও কাঁদি; যে জলবিধি একবার জলশ্রোতে সূর্য্যরশ্মিসম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জ্ঞাত আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—হাইভন্ন মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘরপুড়িয়া গেল—আশুপ্ত নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পক্ষে পঞ্চজ ফুটে কেন? বাড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন?

ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিদের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে, আবার স, ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে তাই, আর নিশ্বাস কেন? স্বর গিয়াছে তাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

কমলাকান্তের জবানবন্দী

খোসনবীশ জুনিয়র শ্রীগীত

সেই আফিদের কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি এক দিন তাহাকে কৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ভাবায় তানাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোতে পাড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিদি চুরি করিয়াছে—অথ সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না, ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে এক জন কালকোষ্ঠী কনুঠেবল দেখিলাম। আমি দাঁড়াইলাম না, কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়। কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন এক জন কনুঠেবল ঝল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া ছই একটি কথা শুনিয়া ব্যাপার-খানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসের প্রথমত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি এক জন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটী। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোর চুরি; ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল।

তখন কমলাকান্ত মুহু মুহু হাসিতে লাগিল।
চাপরাঙ্গী ধমকাইল—“হাস কেন?”

কমলাকান্ত ঘোড়াহাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”

চাপরাঙ্গী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না, দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়, হলফ পড়।”

কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপু।”

এক জন মুহুরি তখন হলফ পড়হিতে আরম্ভ করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—”

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুনুতে পাও না—“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্বনাশ কি?”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি, এ কথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর স্মৃতিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে ছুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম, কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আবার মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ ‘পদবুদ্ধি’ হইত?” প্রকাশে বলিল, “ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষেই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয়, আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন, তাঁহার মূল্যবান সময়, বাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন

গরম হইয়া বলিলেন, “সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাক্সমাজের জন্ত রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।”

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মুহু হাসিয়া বলিল, “আপনি বোধ হইতেছে উকীল।”

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা মহাশয়। আপনাদের জন্ত এ Lecture Theological নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি, যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, “I ask the protection of the court against the insult of this witness.”

কোর্ট বলিলেন, “Oh Baboo, the witness is your own witness, and you are at liberty to sent him away if you like.”

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না; সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত তাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, “ও শপথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে। উহাকে simple affirmation দাও।” তখন মুহুরী কমলাকান্তকে বলিল, “আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও, বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বল।”

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, “ধর্মাবতার, সাক্ষী বড় সেরকম।”

উকীল বাবু বলিলেন, “Very obstructive.”

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি,) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরীকে আদেশ করিলেন যে, “প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।” মুহুরি তখন বলিল, “শোন, তোমাকে

বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাফা দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।”

কমলা। ঠু নধু নধু নধু!

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ভৃত্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, “এখন আর বদমায়েসি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।”

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, কোন কথা গোপন করিব না! ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল, সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব, যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের অপরাধ লাইবেন না।”

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিব—তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহু খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি?”

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আত্মীয়দিক আছে

না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর, এ সব contempt of court।” হুজুর, উকীলের হৃদশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, “আপনারই সাফা।” সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন,—“বল, বলিতে হইবে।”

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন জাতীয়?

কমলা। হিন্দু-জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাফাও আনে? বলি—তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না, বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে, জান ত—তুমি তার কোন জাতির ভিতর?”

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বোঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”

এজলাসে একটি ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—”

উকীল। কি জালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে—কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথায়?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা তো আছে?

কমলা। ছিল, যখন নবীবার ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে?

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, “আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর ?”

উকীল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি ? আমি কি উকীল না বেখা যে, আমার পেশা আছে ?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া ?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল-ভাত জোটে কোথা থেকে ?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কি উপার্জন কর ?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া আদালতকে বলিলেন, “আমি এ সাক্ষী চাই না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।”

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, “এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিথ্যা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জন কর ! ও কি বলিবে ?”

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন, পেশা ভিক্ষা।”

এবার কমলাকান্ত রাগিল,—“কি ? কমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষাপঞ্জীবী ? আমি মৃত্ত কণ্ঠে হলপের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।”

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, সে বলিল, “সে কি ঠাকুর ! কখনও আফিদা চেয়ে খাও নাই ?”

কমলা। দূর মাগী ধেমো গোয়ালার মেয়ে ! আফিদা কি পয়সা ? আমি কখনও একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “কি লিখিব কমলাকান্ত ?”

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, “লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।” সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন ?”

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি ঠাকুর ! চিরটা কাল আমার দুধ-দই খেলে, আজ বল চিনি না ?”

কমলাকান্ত বলিল, “তোমার দুধ-দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ-দই বিলক্ষণ চিনি; যখনই দেখি, এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ। যখনই দেখিতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দধি ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি ! দুধ-দই চিনি নে ?”

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, “আমার দুধ-দই চেন, আর আমার চিনিতে পার না ?”

কমলাকান্ত বলিল, “মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি ? বিশেষ গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে ?”

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, “বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে ?”

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয় ?

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে ?

কমলা। বামনের ছেলের গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না ? কে জানে, তুমি ওর পোষাপুত্র কি না ?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন ? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান ?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমার আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তানয়, গোরুচুরির কি জান ?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ-দাদাও জানেন না। বিত্তাটা আমার শিখাইবেন?—আমার দুধ-দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি, গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। এক দিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বকনা,—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া, গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায় উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, “ও বামন সে সব কিছুই সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।”

উকীল মহাশয় তখন কুল পাইলেন। গজিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গোরু চেন?”

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, “আহা, চিনি বই কি, নইলে কি আপনার সঙ্গে এত মিঠালাপ করি?”

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, “ও সব রাখ।” প্রসন্ন গোয়ালিনীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটী বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোরুটি চেন?”

কমলাকান্ত ষোড়হাত করিয়া বলিল, “কোন গোরুটি ধর্মাবতার?”

হাকিম বলিলেন, “কোন গোরুটি কি? একটা বই ত সামনে নাই।”

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?”

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, “এ শামলাও চুরির না কি?”

কমলাকান্তের নষ্টানী হাকিম আর সহ করিতে পারিলেন না—বলিলেন, “তুমি আদালতের কাজের বড় বিষ করিতেছ—কস্টেবল্ট অফ কোর্ট জন্ত তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।”

কমলাকান্ত আত্মপ্রণত সেলাম করিয়া, ষোড়হাত করিয়া বলিল, “বহুত খুব হজুর। জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?”

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না, জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্ত ধর্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া গোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাঁপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?”

হাকিম তখন এক জন কন্ঠেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কন্ঠেবল তাহাই করিল। বিষয় উকীল তবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ গোরু তুমি চেন?”

কমলা। শিংওয়ালা—তাই বনুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি, শামলাওয়ালা—তাক—আমি ও শিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে!

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার?

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফিসিয়া যায়। প্রসন্ন

কমলাকান্ত

ন করিয়া বলিল, “তবে রে বিটলে!
কি?”

কমলা বলিল, “আমার না ত কার? আমি
গোঁড়—ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল

—ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি—
না খেয়েছি, ও গোঁড় আমার হ'লো না, তুই

বেটা পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোঁড় হ'লো?”
উকীল অতটা বঝিলেন না। বলিলেন,
ধর্মাবতার, witness hostile! permission
দিন, আমি ওকে cross করি।

কমলা। কি? আমার ক্রস করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নোকায়, না সঁাকো বেধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-মাগর পার
হও, এত বড় হুমুমান তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্তী রাগে গরু গরু
করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাসী ধরিয়া
আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত
আলুথালু হইয়া নিশেষ্ট হইল—বলিল, “কর বাবা,
ক্রস কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—
যে ইচ্ছা, সে লক্ষ দাও—‘অপানিবাধারমত্তত্তরদম্!’
উকীল মহাশয়, এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ
করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লস্কন করুন।”

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, “ধর্মাবতার,
দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল, ইহাকে আর
ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া
ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে, ইহাকে
বিদায় দেওয়া হউক।”

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি
পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে
প্রসন্ন হাতযোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল,
“যদি হকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা
কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে
হয়, দিবেন।”

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন।
প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল,
“টাকুর! মোতাতের সময় হয়েছে না?”

কমলা। মোতাতের আবার সময় কি রে বেটা,
রামরবৎ প্রাজ্ঞো বিচাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।”

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মোতাত
কি?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমি
দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জলদি জলদি বল
জলদি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোঁড় কার?

কমলা। গোঁড় তিন জনের, গোঁড় প্রথম বয়সে
গুরুমহাশয়ের, মধ্য-বয়সে স্বীজাতির, শেষ বয়সে
উত্তরাধিকারীর, দড়ি ছিঁড়িবার সময় কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে দুধ খায়, তার।

প্রসন্ন। ও গোঁড় আমার কি না?

কমলা। তুই বেটা কখন ওর এক বিন্দু দুধ
খেলি নে, কেবল বেচে মরলি, গোঁড় তোর
হ'লো? ও গোঁড় যদি তোর হয়, তবে বাদ্দাল
বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটা, গোঁড় চোরকে
ছেড়ে দে।—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় নাড়াবাড়ি
করিতেছে, আদালত মেছোহাটা হইয়া উঠিল।
তখন উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে
লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

“প্রসন্ন এই গোঁড়র দুধ বেচে?”

কমলা। আজ্ঞা হাঁ।

“উহার গোহালে এই গোঁড় থাকে?”

কমলা। ও গোঁড়ও থাকে, আমিও কখন
কখন থাকি।

“ঐ খাওয়ায়?”

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, “আমার কার্য
সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা
করিতে চাই না।” এই বলিয়া তিনি উপবেশন
করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাজোথান
করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আবার তুমি কে?”

আসামীর উকীল বলিলেন, “আমি আসামীর
পক্ষে তোমাকে ক্রস করিব।”

কমলা। এক জন ত ক্রস করিয়া গেল,
আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতাযুগে
আগে ক্রস করিলেন পবনাসজ মহাশয়! তার পর
ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর।*

। গঙ্গা-রাস—তুমি গোক চেন বলোছ
চেন?

কমলা। কখন শিখে—কখন শামলায়।

কমলা উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জন করিয়া টেবিল
না চাপড়াইয়া বলিলেন, “তোমার পাগলামী
রাখ—তুমি এই গোক চিনিতে পারিতেছ
কিসে?”

কমলা। ঐ হাস্য-রসে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, “Hopeless!”
উকীল মহাশয় বসিলেন—আর জেরা করিবেন
না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, “দড়ি ছেঁড়
কেন বাবা?”

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম
কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত উর্দ্ধ-
শ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া
বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো
হুকো হাতে করিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে
লোক জমিয়াছে। প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে।
কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর
বলিতেছে, “তোমার মঙ্গলার বাটের দিব্য—তোমার
ছুরের কেঁড়ের দিব্য,—তোমার বোলমউনির দিব্য,
তোমার ফাঁদি নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে
গোক ছেঁড়ে না দিস!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—চক্রবর্তী
চোরকে গোক ছাড়িয়া দিবে কেন?

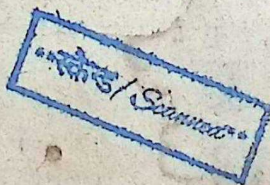
কমলাকান্ত বলিল, “পূর্বকালে ^{রিয়া,} ^{রিমানা}
শ্রোত্রজ্ঞকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল
গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে গো
পনি করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী।
তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।
এই হ'লো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law আর
ইহাই এখনকার ইউরোপের Inter-national Law,
যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া
থাইবে। গো শব্দে বেহুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ,
ইনি তস্করভোগ্য। সেকন্দের হইতে রণজিৎ সিংহ
পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of
conquest যদি একটা Right হয়, তবে Right
of theft কি একটা Right নয়? অতএব হে
প্রসন্ন নামে গোপকর্তা! তুমি আইনমতে কার্য
কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তী হও।
চোরকে গোক ছাড়িয়া দাও।”

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া
গেল। দেখিলাম, মনুষ্যটা নিতান্ত ফেপিয়া
গিয়াছে।

খোসনবীশ জুনিয়ার।

* শান্তিপূর্বক, ১৭৪ অধ্যায়।

সম্পূর্ণ



বড় বিশ্ব কারভে
তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।”

মো.

উকীল
প্রসন্ন